সিন্দবাদের অভিযান



4·4 নীরদবরণ হাজরা



সিন্দবাদের অভিযান

ডঃ নীরদবরণ হাজরা

মণ্ডল এণ্ড সন্স
পুস্তক বিক্রেতা ও প্রকাশক
১৪, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন, ১৩৯১
সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪

প্রকাশক
শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল
মণ্ডল এণ্ড সন্স
১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

প্রচ্ছদ
কুমারঅজিত

অলঙ্করণ
স্বপন দেবনাথ

মুদ্রক
কমল কৃষ্ণ রায়
পারুল প্রেস
৩৮/সি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

দাম : বারো টাকা মাত্র

কৈফিয়ৎ

সিন্দবাদের সাত সাতটি সমুদ্র অভিযানের কাহিনী প্রথম পড়েছি ছেলেবেলায় দ্বিতীয়বার পড়েছি আমার পুত্র কন্যাদের পড়াতে গিয়ে। প্রথমবারে অভিভূত হয়ে ছিলাম। দ্বিতীয়বারে ভিন্ন কথা মনে হয়েছিল। বোধ হয়েছিল, এ কাহিনীতে একজন দুর্জয় মানুষের জীবন যুদ্ধের অসাধারণ সম্ভাবনার বীজ রয়েছে, অথচ তাকে ঢেকে রাখা হয়েছে রূপকথার অবাস্তবতার মোড়কে। শুধু দৃষ্টিভঙ্গির বদল করে যদি এ কাহিনীকে লেখা যায়, তবে কিশোর পাঠক পাঠিকারা এ কাহিনীর অন্তর্নিহিত কৌতূহলেই শুধু আসমাপ্ত গ্রাস করবে না, ঐ খাঁটি মানুষটির কাহিনী থেকে অনুপ্রাণিতও হবে।

এ বোধ থেকেই আমি বিশ্বসাহিত্যের এই অতুল কাহিনীর পুনর্লিখনে প্রবৃত্ত হই। আমি এ কাহিনীর অলৌকিকতার মোড়কটি খুলে নিয়েছি। প্রতিটি ঘাত-সংঘাতকে যুক্তিনিষ্ঠ করেছি। আর সব মিলিয়ে চেয়েছি সঙ্কল্পে অটল, বিপদে অধীর এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও নির্ভয়ে পাঞ্জা লড়বার শক্তি রাখা একটা মানুষের ছবি আঁকতে।

আমার দেশের কিশোর কিশোরীদের যদি এ লেখা আদৌ অনুপ্রাণিত করতে পারে, তবে আমার প্রয়াস সার্থক হবে।

ইতি

নীরদ হাজরা

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

- কিশোর উপন্যাস
  রামরহিমের বন্ধু
- কিশোর ক্লাসিক
  ছোটদের কথাররিৎ সাগর
- আবৃত্তি শিক্ষার আকর গ্রন্থ
  আবৃত্তিকোষ
- মঞ্চের সহায়ক
  মঞ্চে আলোক সম্পাত
- সম্পাদিত গ্রন্থ
  কাশীদাসী মহাভারত
  কৃত্তিবাসী রামায়ন

বিশ্ববিখ্যাত বাগদাদ শহর। পারস্যের রাজধানী। আবার বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দরও বটে। কত দূরদেশ থেকে জাহাজ যায় সেখানে আবার বাগদাদের বণিকেরাও জাহাজ সাজিয়ে সওদা নিয়ে যাত্রা করে কত দেশে। ফলে ঐশ্বর্যে ঐশ্বর্যে ফুলে ওঠে বাগদাদ। আমাদের কল্পনার স্বর্গপুরীকেও বুঝি হার মানায় বাগদাদ —এত সৌন্দর্য সেখানে, এত ঐশ্বর্য্য ; এত সুখ এত আনন্দের উপকরণ !

সেখানকার বাদশা হারুণ-অল রসিদও যেন প্রবাদের মানুষ। তাঁর সম্পর্কে কত যে বিচিত্র গল্প ছড়ান আছে লোকের মুখে মুখে তার সীমা সংখ্যা নেই। তা থেকে বোঝা যায় যে মানুষটা বুদ্ধিমান, রসিক, সহানুভূতিশীল, উদার, রঙ্গপ্রিয় অথচ বিচারশীল।

এত থাকা সত্ত্বেও বাগদাদ কিন্তু সত্যি সত্যি স্বর্গ নয়। এত ভোগ বিলাসের পিছনে, কালো ছায়ার মত ছিল দুঃখ-দারিদ্র-হতাশা দীর্ঘশ্বাস। একদিকে যেমন বাদশার কুকুরের জন্য গাড়ি গাড়ি মাংস যেত, অন্য দিকে দিনান্তে এক ফোটা খাবারের জন্য হাহাকার করত মানুষ। একদিকে প্রসাদের চূড়া আকাশকে ফুটো করে দিতে চাইত, অন্য দিকে কত মানুষের ছিল না মাথা গুঁজবার ঠাঁই। এক দিকে জরির কাজ করা আঁচল লুটিয়ে যেত মাটির বুকে, অন্য দিকে নেংটি জুটত না কত শত জনের। মোট কথা আজকের শহর বন্দরের মত সেদিনের বাগদাদও ছিল আলো-অন্ধকারে মেশান, বিলাস ও উপবাসে জড়ান, ধনী ও নিঃস্ব একাকার করা।

এমনই দরিদ্রকুলে জন্মে ছিল হিন্দবাদ। ছেলেবেলায় কখনও খাওয়া জুটত তার, কখনও জুটত না—কিন্তু তবু আল্লার কৃপায় স্বাস্থ্য তার অটুট ছিল। ফলে বয়স যখন তার বাড়ল, কিশোর হল সে,

তখন সে কুলির কাজ করা শুরু করল। হিন্দবাদ একে পরিশ্রমী তাতে বিশ্বাসী, সৎ; অতএব খবার অভাব হল না তার বরং দু-এক, দিরহাম জমতেই থাকল। যতই জমতে থাকল হিন্দবাদ ততই ঐশ্বর্য এবং সৌভাগ্যবানদের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে থাকল। হায় খোদা। আমার কি ঐ ঐশ্বর্য হতে পারে না! কি পাপ করেছি আমি। আমার ওপর অকরুণ কেন তুমি?

একদিন, দারুণ গ্রীষ্ম, একটা মোট মাথায় করে বাগদাদের পথে চলেছে হিন্দবাদ। সারা গায়ে ঘাম ঝরছে ঝরণা ধারার মত, যেন প্রতিমুহূর্তে কে তার গায়ে ঢেলে দিচ্ছে জল। শ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসছে। মাথার বোঝাটা যেন চাপ দিয়ে মাটির মধ্যে ঠেলে ঢুকিয়ে দিতে চাইছে। একটু বিশ্রাম না করে নিলেই নয়।

এমন সময় তার রাস্তার পাশে পড়ল এক মস্ত ফটকওয়ালা বাড়ি। সামনে একটা খোলা বারান্দা। মুসাফিরদের জন্য এমন খোলা বারান্দা সে কালে বাগদাদের অনেক ধনী ব্যক্তিই রাখতেন। পাশে হিন্দবাদের সমান উঁচু একটা প্রাচীর। বাঃ, খুবই ভাল ব্যবস্থা। হিন্দবাদ ঐ প্রাচীরের ওপর মাথার বোঝা নামিয়ে রাখল। তুলবার সময় আর কারো সাহায্য চাইতে হবে না। বাড়ির মালিক যেন তার কথা ভেবেই ঐ ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন।

মোট রেখে বারান্দায় একেবারে গা এলিয়ে দিল হিন্দবাদ। এমন সময় গোলাপ গন্ধে ম-ম করে উঠল জায়গাটা। কোথা থেকে এলো গন্ধ! হিন্দবাদ উঠে বসল। উঁচু বারান্দায় বসায় এবার ফটকের ওপর দিয়ে ভেতরের বাগানটা দেখা যাচ্ছে। ফুলে ফুলে ফুলময়। আরও ভাল করে দেখে হিন্দবাদ বুঝল বাগানের বেশির ভাগই গোলাপের গাছ। চোখ জুড়িয়ে যায়, মন ভরে যায়। বুক ভরে শ্বাস টানল হিন্দবাদ। কিন্তু···হ্যাঁ, ক্রমেই গন্ধ বাড়ছে কেন? না, কোন হাওয়া নেই যে হাওয়ার তোড়ে বেশি বেশি গন্ধ ছুটে আসবে! তবে?

একটু পরেই হিন্দবাদ দেখল, চারদিক থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির



মত জলের কণা ছড়িয়ে পড়ছে। বুঝল, তার থেকেই ভেসে আসছে গোলাপের বাস। এমন সময় হিন্দবাদ দেখল একদল ক্রীতদাস বিরাট বিরাট বালতিতে গোলাপজল এনে পিচকিরি করে চারদিকে ছিটিয়ে দিয়ে জায়গাটাকে ঠাণ্ডা করছে, আর সেই সঙ্গে করছে সুবাসিত। চোখ বড় বড় হয়ে গেল তার। ভাবল, যে গরমে সে অত ভারি বোঝা নিয়ে ঘামে ভিজে ছুটছে ক'পয়সা রোজগারের জন্য, সেই সময় কিনা, এই বাড়ির মালিকের সুখের জন্য এতগুলি লোক, এত এত টাকার গোলাপজল মাটিতে ঢালছে! হায় খোদা! কত দিরহাম আছে লোকটার!

হিন্দবাদ যখন মনে মনে এইসব ভাবছে তখনই ভেতর থেকে রবাবের আওয়াজ ভেসে এলো। কিন্তু সুরটা একটু করুণ। মনে হচ্ছে সারা পৃথিবী কেঁদে কেঁদে সূর্যের তাপ থেকে মুক্তি চাইছে। সুরটা হিন্দবাদের মনের দুঃখের সঙ্গে মিশে গেল। ও সুরে সুর মিলিয়ে গেয়ে উঠল,

খোদা! তোমার একি অবিচার!
তাপ ঘোচাতে কেউ ঢালছে জলে গোলাপ সার—
আর হিন্দবাদের মাথায় দিলে
বিষম বোঝার ভার।
তোমার একি অবিচার!

প্রাণ ঢেলে গান গাইল হিন্দবাদ। গাইতে গাইতে মনটা প্রসন্ন হ'ল। দুঃখ অনেকটা ঝরে গেল। দেহও ততক্ষণে শ্রান্তি ভুলেছে। হিন্দবাদ উঠে দাঁড়াল। এবার বোঝা নিয়ে ছুটতে হবে। সে তো ধনীর দুলাল হয়ে জন্মায় নি যে পায়ে পা দিয়ে বসে থাকবে।

সবে সে বোঝাটা তুলতে যাচ্ছে এমন সময় পাহাড়ের মত বিশাল, অন্ধকারের চেয়েও কালো এক ক্রীতদাস এসে ধরল তার হাত চেপে। বলল, তুমিই এতক্ষণ গান গাইছিলে না?

ভয় পেয়ে গেল হিন্দবাদ। সে বলল, ভাই বুঝতে পারি নি যে

এখানে গান গাওয়া নিষেধ। আমায় ছেড়ে দাও। আমি জীবনেও আর এদিকে আসব না।

ক্রীতদাসটির মন গল্‌ল বলে মনে হ'ল না। সে বলল, ভয় নেই, তুমি ভেতরে চল। আমার মনিব তোমায় ডাকছেন।

এ কথা শুনে আরও ঘাবড়ে গেল হিন্দবাদ। এতবড় প্রাসাদ যাঁর, এত লোকলস্কর অবিরাম কাজ করছে যাঁর বাড়িতে তিনি তার মত মুটে-মজুরকে ডাকবেন কেন? সে তো তাঁর ইয়ার বক্সী নয়, সম-পর্যায়ের লোকও নয়। তবে? গিয়ে নিশ্চয় ঘ্যাচাং করে···· ওরে বাবা! হাত পা যেন সিঁটিয়ে যেতে থাকল হিন্দবাদের।

ওর গলা দিয়ে পাঁচ রকম সুর বের হ'ল। তবুও জিজ্ঞাসা করল, তোমার প্রভুর নাম কি ভাই?

ক্রীতদাসটি বলল, সেকি! আমার প্রভুর নাম জান না। তোমার বাড়ি কি বাগদাদে নয়?

হিন্দবাদ বলল, বাড়ি আমার কোথাও নেই, তবে আমি বাগদাদেরই মানুষ। এখানেই জন্ম। এখানেই বড় হয়েছি। কিন্তু আমার মত লোকের পক্ষে কি আমীর ওমরাহের খোঁজ রাখা সম্ভব।

ক্রীতদাসটি বলল, তবু বণিক সিন্ধুবাদের নাম শোনে নি এমন লোক কি বাগদাদে আছে?

সিন্ধুবাদের নাম শুনে হিন্দবাদ আরও ঘাবড়ে গেল। তাঁর কথা কে না শুনেছে। তাঁর সম্পর্কে অমন সাত শ' গল্প হিন্দবাদ নিজেও জানে। তাঁরই এ বাড়ি তা কি জানত সে! আর ভাগ্যদোষে কি না সেই বাড়িতেই গান গেয়েছে হিন্দবাদ!

সে আবার ক্রীতদাসটিকে ছেড়ে দিতে বলল। ক্রীতদাসটি এবার হাসল। বলল, আবার তোমায় বলছি, ভয় পেয়ো না। আমার মনিবের মত লোক হয় না।

হুঃ! সব চাকরেই মনিব সম্পর্কে অমন কথা বলে। মনে মনে বলল হিন্দবাদ। কিন্তু ভয় ঝেড়ে ফেলে দিল। মরতে যখন হবে বীরের মতই মরবে সে। বলল, চল, যাচ্ছি। কিন্তু আমার মোটের কি হবে?

ক্রীতদাস বলল, মোট পাহারার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এই বলে সে একটি প্রহরীকে ডাকল। তাকে ঐ মাল রক্ষার দায়িত্ব দিল। এবার বলল, চল।

হিন্দবাদ চলল ক্রীতদাসটির পিছনে পিছনে। ফটক পেরিয়ে বাগান, বাগান পেরিয়ে দর-দালান। তারপর কয়েকটি ঘর পেরিয়ে একেবারে এক বিশাল সভাঘরে। সর্বত্র ঝকঝকে তকতকে সাজান শোভায় চোখ জুড়িয়ে যায়। সুবাসে মন মাতাল হয়ে ওঠে। কোথায় গ্রীষ্মের তাপ। হিন্দবাদের একটু বুঝি শীত শীতই করে।

সভাঘরে ঢুকে হিন্দবাদ একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। এ কোথায় এলো সে। চারদিকে হুরী-পরীর মেলা। যেমন তাদের রূপ, তেমন তাদের পোষাক। মাঝে লম্বা মেজে চিকনের কাজ করা চাদর বিছান। তাতে থরে থরে নানা খাদ্য দ্রব্য সাজান। চারদিকে অতিথি অভ্যাগতের ভীড়। সেই সব সুন্দরী বাঁদীরা তাদের সব খাবার পরিবেশন করছে।

ক্রীতদাসটি তাকে এনে হাজির করল এক বৃদ্ধের সামনে। তার সারা মুখে সাদা গোঁফ-দাড়ি। মাথার চুল পাকা। মুখে সদাশয় হাসি। হিন্দবাদকে দেখে মিষ্টি হেসে বললেন, বাইরে বারান্দায় বসে তুমিই গান করছিলে ভাই?

হিন্দবাদ বলল, হ্যাঁ হুজুর। গান গেছিলাম।

সিন্ধুবাদ বললেন, তোমরে গানের সুর বড় করুণ। কিন্তু কথাগুলি বড় কড়া। খোদার ওপর তোমার অত রাগ কেন ভাই!

হিন্দবাদ মাথা নীচু করল। তারপর হঠাৎ মাথা উঁচু করে বলল, অভয় দেন তো বলি হুজুর!

সিন্ধুবাদ বললেন, তুমি নির্ভয়ে বল ভাই। এখানে সকলে সব কথা খোলা মনে বলতে পারে।

হিন্দবাদ বলল, তবে বলি হুজুর। আমি এক গরীব মুটে। এই গরমে মাথায় বোঝা নিয়ে ছুটতে ছুটতে যখন দেখি আপনি আয়েস করতে গোলাপ জল ছেটাচ্ছেন, তখন আমাদের ভাষাটা একটু

কড়াই হয়ে যায়। আপনারা যারা অনায়াসে অনেক পেয়ে বিলাসে মেতে থাকেন, তারা আমাদের কথা বুঝবেন না।

খুব হাসলেন সিন্ধুবাদ। ক্রীতদাসকে কি ইঙ্গিত করলেন। সে ভিজে কাপড় এনে মুছিয়ে দিল হিন্দবাদের গা। তাকে এবার সিন্দবাদ বসতে বললেন। সসঙ্কোচে পাশে বসল সে। সিন্ধুবাদ নিজে তাকে খাবার পরিবেশন করলেন। ঠিক কি ব্যাপার হতে চলেছে তা না বুঝলেও ও সব খাবার সামনে নিয়ে বসে থেকে কি লাভ। অতএব খেতে শুরু করল হিন্দবাদ। সিন্ধুবাদ তার নাম জানতে চাইলেন। হিন্দবাদ বলল তার নাম।

তখন সিন্ধুবাদ বললেন, শুনুন আমার অভ্যাগত অতিথিরা, মেহেমানরা! আমার এই নতুন অতিথির নাম হিন্দবাদ আর আমার নাম সিন্ধুবাদ। নামে সামান্য তফাৎ কিন্তু ভাগ্যের তফাৎ অনেক। আমাকে আপনারা জানেন বণিকের বণিক বলে আর এ সামান্য কুলি। আমার এই বন্ধু একে বলেছেন খোদার অবিচার। আমার বন্ধু ভেবেছেন, এ ধন-ঐশ্বর্য আমি অনায়াসে পেয়েছি। না, বন্ধু অনায়াসে এ পৃথিবীতে কিছুই পাওয়া যায় না। আর আয়াস করলে পাওয়া যায় না, এও হয় না। আমি কি ভাবে ঐশ্বর্যবান হয়েছি জানেন?

মেহেমানরা বললেন, না। জানি না।

কেউ বললেন, বলুন সে গল্প।

সিন্ধুবাদ বললেন, তবে শুনুন সেই কাহিনী:



সিন্ধুবাদ বলতে শুরু করলেন,

একথা ঠিকই ঈশ্বর আমাকে দরিদ্রের ঘরে পাঠান নি বরং অতুল ঐশ্বর্যের মধ্যেই পাঠিয়েছিলেন। আমার বাবাও ছিলেন এক সম্ভ্রান্ত সওদাগর। তাঁর অতুল ঐশ্বর্যও তিনি নিজে গড়েছিলেন। একা ভোগ করা তাঁর ইচ্ছে ছিল না, তাতে তাঁর মনও ভরত না। তাঁর বাড়িতে নিত্য অতিথির আনাগোনা ছিল, নিত্য তিনি গরীবদের দান করতেন। ছোট্ট আমি, ঘুরে ঘুরে সব দেখতাম। দেখতাম আর ভাবতাম এসব যেদিন আমার হবে, সেদিন দেখিয়ে দেব বিলাস কাকে বলে আর দান কাকে বলে।

খোদা বোধ হয় আমার কথা শুনলেন। আর তাই আমাকে শিক্ষা দিতেই বাবাকে টেনে নিলেন নিজের কাছে। বাবার মৃত্যুতে দুঃখ খুবই পেলাম। কিন্তু আনন্দও কম হল না। এ অতুল ঐশ্বর্য্যের মালিক আমি। এবার দেখব বিলাস কাকে বলে আর দানই কেমন হতে পারে! কিন্তু কিছুই করতে পারলাম না। আমি তখন নাবালক। বাবা আগেই আমাদের এক ধার্মিক আত্মীয়কে অছি করে রেখেছিলেন। তিনি আমার বাধা হয়ে দাঁড়ালেন।

আমি তাঁকে মানতে চাইলাম না। বললাম, আমি তো চিরকাল নাবালক থাকব না। যে দিন সাবালক হব সেদিন আমাকে আটকাবেন কি ভাবে!

তিনি বললেন, বাবা। সবই তোমার। তোমার মঙ্গলের জন্যই দেদার খরচ করতে নিষেধ করছি। মনে রেখো, অর্থ উপার্জন বড় কম কথা নয়। আবার বসে খেলে সমুদ্রও শুকিয়ে যায়। মনকে সংযত কর। রয়ে-সয়ে—

আমি থামিয়ে দিয়ে বললাম, মসজিদে গিয়ে উপদেশ দিন। আমার যা করবার তা আমি করব।

তিনি বললেন, এখনও বলছি সিন্ধুবাদ! নিজেকে সংযত কর। নইলে তোমায় ভিক্ষা করে খেতে হবে।

আমি তাঁর সামনে থেকে চলে গেলাম।

বেশি দিন নয়, বছর দু'তিনের মধ্যে আমি সাবালক হলাম। তিনি আমাকে সব হিসাব বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, যদি রেখে খেতে পার, সাত পুরুষ নিশ্চিন্তে থাকবে। যদি উড়িয়ে দাও, ভিক্ষা করবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করো!

আমি তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বেরিয়ে এলাম। নিজের খুশীমত বিলাসে দিন কাটাতে লাগলাম। নিত্য উৎসব। বাগদাদের সমস্ত আমীর ওমরাহ আমার নামে জয়ধ্বনি দিতে থাকলেন। দিনে সাতবার পোষাক বদলাতাম আমি। কোন পোষাক দ্বিতীয়বার পরতাম না। কি সুখ! অবিরাম আনন্দ।

কিন্তু হয়ত মাস দুয়েকেও নয়, আমার ঐশ্বর্য তলানিতে এসে ঠেকল। অতিথি-অভ্যাগতেরা আসা বন্ধ করলেন। আমীর-ওমরাহেরা আমাকে আঙ্গুল তুলে দেখিয়ে বিদ্রূপ করে হাসতে থাকলেন। চার দিক থেকে বন্ধু-বান্ধব সব সরে গেল। কর্মচারীরাও কেউ থাকল না। আমি সারাদিন একা ঘরের মধ্যে পড়ে রইলাম। দিনে সাতবার কেন, সাতদিনে একবার পোষাক বদলাবারও সম্বল রইল না।

এর ওপর আর এক উৎপাত শুরু হ'ল। আসা শুরু করল পাওনাদারেরা। যেটুকু যা সেখানে ছিল, তারা জোর করে তুলে নিয়ে গেল। আমি একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেলাম। এবার কি তাহ'লে সত্যিই ভিক্ষা করতে হবে?

মনে পড়ল বাবা পয়গম্বর সুলেমান ইবন-দাউদ-এর একটা বয়েৎ খুবই বলতেন।

জন্মক্ষণ শুভ নয় দায়যুক্ত করে
দায়মুক্ত হই মৃত্যু পেয়ে।

মৃত সিংহে কিবা লাভ পাই যদি জীবন্ত কুকুর,
মৃত্যু শ্রেয় দারিদ্র্যের চেয়ে॥

ঠিক। দরিদ্রের চেয়ে মৃত্যু অনেক ভাল। তা'হলে কি আমাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে! আমার সেই আত্মীয়ের কথা মনে পড়ল। তিনি বলেছিলেন, ভিক্ষে করবার আগে যেন তাঁর সঙ্গে দেখা করি। লজ্জা হ'ল। আজ বুঝলাম, তিনি আমার সত্যিকার হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

আমি যেতেই তিনি আমাকে সাদরে ডেকে নিলেন। বললেন, এসো বাবা! আমি তোমারই মুখ চেয়ে ছিলাম।

আমি মাথা নিচু করে রইলাম।

তিনি বললেন, যা হয়েছে, তা নিয়ে অনুশোচনা করো না। খোদা যা করেছেন, ভালর জন্যই করেছেন। দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়েই মানুষ বড় হয়। তুমিও বড় হবে!

কিন্তু কিভাবে? আমি প্রশ্ন করলাম।

তিনি বললেন, বণিকের ছেলে তুমি, বাণিজ্য করে বড় হবে!

আমি বললাম, কি নিয়ে বাণিজ্য করব? মূলধন!

তিনি বললেন, তোমার বাড়ি ঘর জমি-জমা যা আছে বিক্রি করে দাও। যা পুঁজি হবে তাই নিয়ে শুরু কর। অনেক অল্প পুঁজির বণিক একত্রে জাহাজ ভাড়া করে বিদেশে যায়, তাদের সঙ্গে ভিড়ে যাও। দরকার হ'লে আমি তেমন দলের সঙ্গে যোগ করিয়ে দেব। মনে রেখ, নিজের শক্তিতে তোমায় বড় হতে হবে।

তাঁর কথায় ভীষণ উৎসাহ পেলাম। ঠিক! ভাগ্যের সাথে শুরু হ'ক হারজিতের খেলা। একটা অদ্ভুত উন্মাদনায় মন ভরে গেল।

তিন চার দিনের মধ্যে সব জমিজমা বিক্রি করে দিলাম। বাজারে বাজারে ঘুরে বিদেশে বাণিজ্যের জন্য সওদা করলাম। সওদা করতে করতেই দু'তিনজন বণিক বন্ধু জুটে গেল। সবাই মিলে একটা জাহাজও ঠিক করে ফেললাম। মাথায় করে মোট নিয়ে গেলাম

জাহাজে। অবশেষে একদিন জাহাজ বাগদাদ ছেড়ে বসরার দিকে চলতে শুরু করল।

বসরা শুধু নয়, বসরার পর আরও আরও বন্দর, আরও আরও দ্বীপ। প্রতি বন্দর বা দ্বীপেই আমরা সওদা নিয়ে নামি। কিছু কিছু বিক্রি হয়। লাভের অঙ্ক দেখে মাথা ঘুরে যায়। এক দিরহামের জিনিস বিক্রি হয় দশ দিরহামে। ঐ অর্থে আবার জিনিস কিনি আমরা। লাভের টাকায় আবার লাভ। বুকে আশা জাগে, তাহ'লে ঐশ্বর্যের মুখ দেখা অসম্ভব নয়। আনন্দে চোখে জল আসে। বাবা কত দূরদর্শী। ঠিক লোককে আমার অছি নিযুক্ত করেছিলেন।

এইভাবে চলতে চলতে আমরা এক আশ্চর্য দ্বীপে এসে পৌঁছালাম। কাপ্তেন বললেন, এ দ্বীপ তিনি এর আগে দেখেন নি। কি ভাবে এ দ্বীপ এখানে এলো কে জানে!

আমরা হাসলাম। দ্বীপের তলায় তো আর জাহাজ থাকে না যে ভেসে ভেসে বেড়াবে! আর যে দ্বীপে এত বড় বড় গাছ, শস্য-শ্যামল প্রান্তর, তা যে ওখানে দু-একদিন আগে ভেসে উঠেছে, তা তো সম্ভব নয়! আমরা কাপ্তেনকে ঠাট্টা করেই সে দ্বীপে নেমে পড়লাম। কে একজন বলল, আজ আর জাহাজে খাওয়া নয়, দ্বীপেই রান্না, দ্বীপেই খাওয়া।

সকলে সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠল। দেখলাম মাঝিমাল্লারাও এ প্রস্তাবে সানন্দে যোগ দিয়েছে। নামান হয়েছে হাঁড়িকুড়ি, রান্নার সরঞ্জাম। একদল বেরিয়েছে মিঠে জলের খোঁজে, একদল দ্বীপটিকে চিনতে।

আমি একা একা চলেছি তীর ধরে। কি অপূর্ব সৌন্দর্য দ্বীপটার। গাছ-গাছালিতে কত রং-এর সবুজ। কত ফুল-ফল। এমন কি আপেল আঙুরও দেখলাম। আশ্চর্য! দ্বীপে একটাও পাখি নেই! না থাক, সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেলাম।

এমন সময় হঠাৎ যেন ভূমিকম্প শুরু হ'ল। কাপ্তেন চীৎকার

করে বললেন, সর্বনাশ! এ দ্বীপ নয়। কোন বিশালকায় তিমি যুগ যুগ ধরে স্থির হয়ে ঘুমচ্ছিল। তাতেই পলি জমেছিল পিঠে। তাতেই গাছ-গাছালি। তোমরা আগুন জ্বেলে তার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়েছে। এখন তাড়াতাড়ি ওঠো সব। এখুনি আড়মোড়া দিয়ে তিমি তলিয়ে যাবে।

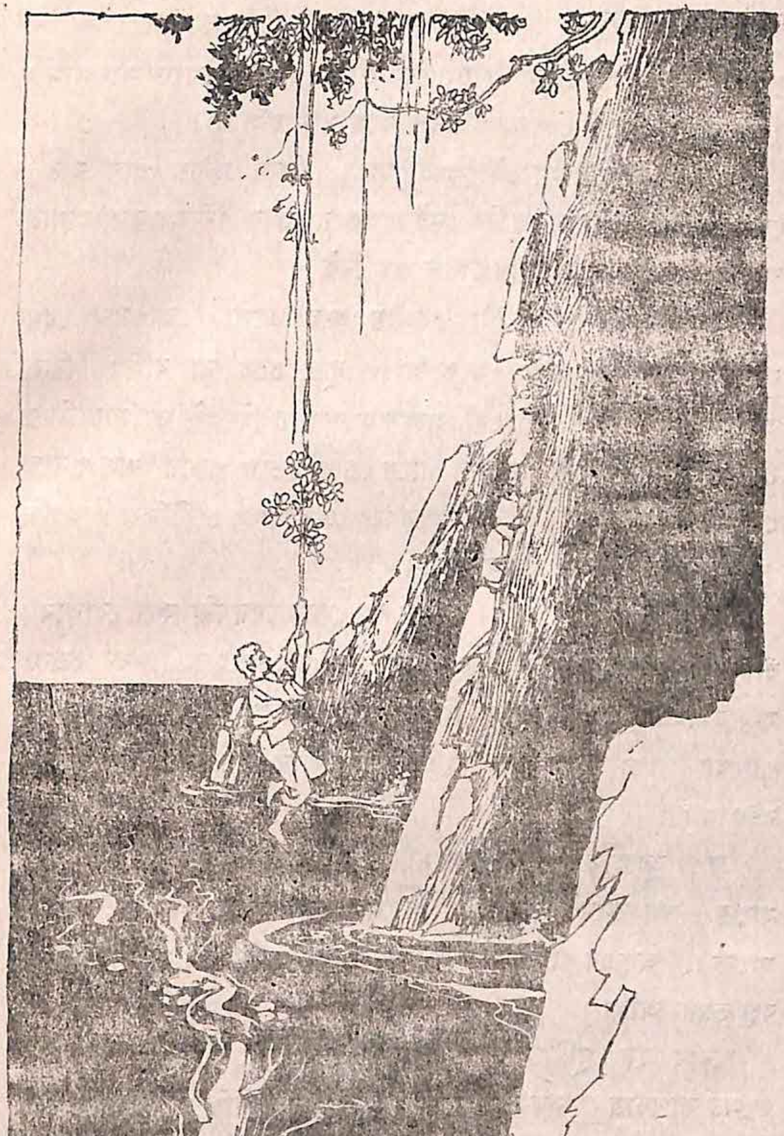
সর্বনাশ! চিন্তার অবকাশ নেই। পায়ের তলায় মাটি দুলছে। তবু পড়ি মরি ছুটছি জাহাজের দিকে। পড়ে রইল খাবারের আয়োজন, পোষাক-আসাক। যে যেমন করে পারল দৌড়াল জাহাজের দিকে। সরু সিঁড়ি। তাড়াতাড়ি ওঠাও যাচ্ছে না। হুড়োহুড়ি করছে সবাই। আমি প্রায় জাহাজের কাছে এসে গেছি। হঠাৎ ভুস করে গোটা দ্বীপটা জলের তলায় তলিয়ে গেল।

দ্বীপটি তলিয়ে যাবার ফলে জলে যে আলোড়ন হ'ল তাতে জাহাজটা যেন একাত ওকাত হয়ে পাঁপড় ভাজা হয়ে গেল। সরে গেল অনেক দূরে।

আমি জাহাজে উঠতে পারলাম না। দ্বীপটা হঠাৎ ডুবে যাওয়ায় আমিও জাহাজ থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়লাম। ডুবতে ডুবতে চিৎকার করতে থাকলাম রক্ষা কর, রক্ষা কর। কিন্তু কে কাকে রক্ষা করে। সবাই নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত। গোটা জাহাজই যেখানে ডুবু ডুবু অবস্থা সেখানে কে আমাকে রক্ষা করবে। আমি বুঝলাম যে আমার মৃত্যু সন্নিকট।

কিন্তু হঠাৎই ভেসে উঠল একটি গাছ। বোধ হয় তিমির পিঠের মাটি সরে যাওয়ায় গাছটা মুক্তি পেয়ে ভেসে উঠেছে। জড়িয়ে ধরলাম গাছটাকে। অনেক চেষ্টায় উঠে বসলাম তাতে। ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেলাম। খোদাকে ধন্যবাদ দিয়ে ক্লান্ত শরীরে গাছের দুটি ডালের খাঁজে নিজেকে বেঁধে শুয়ে পড়লাম। এক সময় ঘুমিয়েও পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙ্গল তখন ভোর হয়ে আসছে। সামনেই পুবদিক। ক্রমশঃ লাল হয়ে উঠছে আকাশ। উজ্জ্বল হচ্ছে। পাখিও উড়তে দেখা যাচ্ছে। তা'হলে ডাঙ্গা দূরে নয়। প্রাণে বল এলো। তা'হলে



অনাহারে শুকিয়ে বা হাঙ্গর-তিমির মুখে প্রাণ দিতে হবে না। আমি তুই পা দিয়ে জল টেনে গাছটাকে তীরের দিকে ঠেলতে লাগলাম। কিন্তু তাতে আদৌ কোন লাভ হল বলে মনে হ'ল না।

সারাটা দিন ঐ গাছেই কেটে গেল। ক্ষিধে তেষ্টায় প্রাণ যায়। কোন কাজ করবার শক্তি নেই। শুয়ে শুয়ে নিজের হতভাগ্যের কথা চিন্তা করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

বিকেলের দিকে কষ্টটা সহনীয় হয়ে এলো। হাওয়ার বেগ বাড়ল। ভয় হ'ল ডাঙ্গা থেকে আরও দূরে চলে না যাই। কিন্তু আমার ভাগ্য ভাল। হাওয়া আমাকে ডাঙ্গার দিকেই তাড়িয়ে নিয়ে চলল। সন্ধ্যার মুখে ডাঙ্গার গায়ে স্রোত ভেঙ্গে পড়ার শব্দ শুনতে পেলাম। কিন্তু তার পরেই অন্ধকারে ঢেকে গেল চারিদিক। আমি আর কিছুই দেখতে পেলাম না।

কি যে উৎকণ্ঠায় রাত কাটল তা তোমাদের কি করে বোঝাব! যদি হাওয়ার গতি বদলে যায় বা স্রোতের বেগ বাড়ে! অথবা স্রোত যদি হঠাৎ গাছটাকে নিয়ে গিয়ে পাড়ে আছাড় মারে? সারারাত চোখের পাতা এক হ'ল না। আমি কান খাড়া করে জেগে বসে রইলাম।

তবে বুঝলাম কপাল ভাল। গাছ ক্রমেই ডাঙ্গার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে—শব্দ ক্রমেই বাড়ছে। গাছের ডালপালার দিকটাই আগে যাচ্ছে। অতএব ধাক্কা লাগলেও হয়ত' খুব ক্ষতি হবে না। সবচেয়ে বড় ভরসা আল্লা।

বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। শেষ রাতে ঘুম ভেঙ্গে গেল জলের ঝাপটায়। বুঝলাম ডাঙ্গার কাছে এসে গেছি। কিন্তু ভোরের আলো না ফুটলে ডাঙ্গায় নামা যাচ্ছে না। তাই ভোরের অপেক্ষায় রইলাম।

ভোর হ'তে ডাঙ্গার রূপ স্পষ্ট হ'ল। খাড়া পাহাড়। সেই জন্যই এত ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ আর জলের ঝাপটা। সেই খাড়া পাহাড়ের কোথাও এমন কিছু নেই যা ধরে ওঠা যেতে পারে।

এখানেই একটা ছোট কাঠের গুঁড়ি ভাসতে দেখলাম। এতক্ষণের আশ্রয়দাতা গাছটিকে ছেড়ে, সেটির দু-দিকে পা ঝুলিয়ে বসে কোন-ক্রমে ঠেলে ঠেলে, দ্বীপটাকে ঘুরতে শুরু করলাম।

দুদিন খাওয়া নেই, জলপান নেই। দেহ আর বইছে না। তবু শুধু মনের জোরে বেয়ে চললাম। এ ছাড়া বাঁচবার আর পথ নেই। ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই হবে।

দুপুরের কাছাকাছি এক জায়গায় একটা বটগাছ পেয়ে গেলাম। মস্ত মস্ত ঝুরি নেমেছে গাছটার। তারই একটা আমার হাতের কাছে। সেটা ধরে ঝুলে পড়লাম। সঙ্গে সঙ্গে স্রোতে কাঠের গুড়িটা ভেসে গেল।

কোথা থেকে শক্তি পেলাম জানি না। একটু একটু করে ঝুরি বেয়ে ওপরে উঠলাম। মূল গাছে এসে তার আর একটা ঝুরি বেয়ে নামলাম পাহাড়ের ওপর। ভেতর দিকটা খাড়া নয়। চেষ্টা করলে নামা যাবে।

কিন্তু পায়ে আর বল নেই। নীচে দূরে জল দেখা যাচ্ছে। জল দেখে তেষ্টা বেড়ে গেল। আমি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নামতে থাকলাম। বুক ছিঁড়ে যাচ্ছে পাথরের ঘষায়, হাতের চেটোয় ফোস্কা, হাঁটু ছিঁড়ে গেছে—ভ্রূক্ষেপ নেই। জল চাই—জল। জলের অন্য নাম জীবন। আঃ এক সময় পৌঁছে গেলাম জলের কাছে। জলে মুখ ডুবিয়ে জন্তুর মত জল খেলাম। দুদিন বাদে খাওয়া জল সারা শরীরে যেন ছুটে বেড়াতে থাকল। আমি সে আবেগ সহ্য করতে পারলাম না। জ্ঞান হারালাম।

সারা গায়ে অসহ্য জ্বালায় জ্ঞান ফিরে এলো। সারারাত অচৈতন্য অবস্থাতেই কেটেছে। না হ'লে নতুন সূর্যের আলো পড়বে কেন গায়ে। একটা জিনিস বুঝলাম এখানে হিংস্র প্রাণী নেই। থাকলে রাতেই আমাকে খেয়ে ফেলত! কিন্তু পায়ের এ কি দশা। সারা পায়ে ঘা। বুঝলাম সামুদ্রিক মাছে ঠুকরেছিল। ভেতরে ভেতরে এত উত্তেজিত ছিলাম যে তখন জ্বালা বুঝিনি। এখন ঘা হয়ে জ্বালা করছে। ঘাস চিবিয়ে সর্বত্র লাগিয়ে দিলাম।

কিন্তু মনে হচ্ছে সারাদেহ বাতাসে ভাসছে। দেহের কোন শক্তি নেই। থাকবে কোথা থেকে। পেটে দানা পড়েনি ক' দিন, ক' রাত। কিছু খেতেই হবে।

আসে পাশে নারকেল ছিল। গাছ থেকে নারকেল পড়েছে। তা ছুলে ফাটিয়ে খাবার শক্তি নেই। অন্য কোন ফল চাই। হামাগুড়ি দিয়ে কোনক্রমে ফলের সন্ধানে চললাম।

খোদা সহায়। অল্পদূরেই পেলাম কলার ঝাড়। অজস্র পাকা কলা। পেট ভরে খেলাম। কিছু নিয়েও এলাম। জলাশয়টির পাশে একটা চওড়া পাথরের ওপরে আমার থাকবার জায়গা স্থির করলাম। খাওয়া-থাকা-বিশ্রাম এই এখন কদিনের সূচী। আগে সুস্থ হতে হবে। তারপর অন্য চেষ্টা।

দিনকতক এভাবেই কেটে গেল। এখনও পায়ের ঘা সারেনি। কিন্তু দেহে বল ফিরে পেয়েছি। শরীর ঝরঝরে। একটু টেনে টেনে হাঁটতে হলেও হাঁটতে পারি। বনে আরও নানা রকম ফল আছে। ফলাহার হলেও ভালই লাগছে। রোজই এদিক ওদিক ঘুরে সাধ্যমত দ্বীপটাকে চিনে নিতে লাগলাম।

একটা জিনিস বুঝলাম, দ্বীপটি খুব ছোট নয়। আর আমি যে দিকে এসে পৌঁছেছিলাম সেদিকটি ছাড়াও আরও তিন দিকই খাড়া পাহাড় ঘেরা নয়। একটা দিক পাহাড় শূন্য সমতল ভূভাগ আছে। আমাকে সেদিকে যেতে হবে। এ দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাবার এটিই পথ।

আরও কয়েক দিনে শক্তি আরও ফিরে এলো। আর খুঁড়িয়ে হাঁটতে হচ্ছে না। এবার আমার এতদিনের শয্যা-শিলা ছেড়ে যেতে হবে। মনটা একটু বিষণ্ণ হ'ল। বললাম, দুর্দিনের বন্ধু। তোমায় ভুলব না। আমাকেও ভুল না বন্ধু। বলে সেই শিলায় নিজের নাম লিখলাম। তারপর চলতে থাকলাম সমতল-মুখো।

তিন দিন হেঁটে সমতলে পৌঁছালাম। এ তিন দিনে কয়েকটি

পাখি ছাড়া আর কোন প্রাণীর সাক্ষাৎ পাই নি। আগের দিন যেন দূর থেকে ঘোড়ার ডাক শুনতে পেয়েছি। আনন্দ হয়েছে। এ ঘোড়া কি বুনো ঘোড়া। বুনো ঘোড়া তো একা থাকে না। কিন্তু আমি তো একটিই ঘোড়ার ডাক শুনেছি। তবে কি ও পোষা ঘোড়া? তাহলে নিশ্চয় মানুষ আছে সঙ্গে। নাকি আমার মতই ও সমুদ্রে ভেসে এসেছে?

অবশেষে সন্দেহের অবসান হ'ল। ঘোড়াটির সাক্ষাৎ পেলাম। সমুদ্রের পাড়ে দড়ি দিয়ে বাঁধা আছে ঘোড়াটি। অতএব লোক আছে। আমি মানুষের কাছে এসে পেঁ ছিছি। এ ঘোড়ার মালিক বা মালিকদের সঙ্গেই আমি লোকালয়ে পেঁ ছাতে পারব।

কিন্তু কোথায় মানুষ। ভাল করে দেখতে মানুষের পায়ের ছাপ নজরে এলো। সে ছাপ দেখে যে আমার কি আনন্দ, তা কি বলব। ছাপ দেখে দেখে এগুতে থাকলাম। যেখানে সেই পায়ের চিহ্ন শেষ হয়েছে, সেটা একটা গহ্বর। আমি সেখানে দাঁড়িয়ে চিৎকার করতে থাকলাম।

একটু পরেই তিন-চারজন সৈনিক পুরুষ শূল উঁচিয়ে ছুটে এলো। আমার পরিচয় চাইল। আমি সব বললাম। শুনে সহানুভূতিতে তাদের চোখে জল এলো। তারা আমাকে ভেতরে নিয়ে গেল। সেখানে সুন্দর থাকবার ব্যবস্থা। আয়োজনও নানা রকম। ওরা আমাকে পোষাক দিল, খাবার দিল। আমাকে বন্ধু করে নিল।

ওদের পরিচয়ও আমি জানলাম।

ওরা সকলেই সুলতান মিরজানের লোক। এ দ্বীপটাও তাঁরই এলাকার। এ দ্বীপে মাঝে মাঝেই সমুদ্র থেকে সিন্ধুঘোটক উঠে আসে। সুলতান চান সিন্ধুঘোটকের বাচ্চা। কিন্তু তা পাওয়া তো সহজ নয়। তাই তিনি এখানে ঘোড়া বেঁধে রেখে ফাঁদ পাতেন। কখনও সে ঘোড়াও ধরা পড়ে, কখনও ওদের ঘোড়ার পেটেও সিন্ধু-ঘোটকের বাচ্চা হয়। দ্বিতীয়টাই বেশি লাভজনক। কারণ খাঁটি

সিন্ধুঘোটকের বাচ্চা বাঁচান যায় না। ওরা সুলতানের অশ্ব তদারকের কাজে নিযুক্ত আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সিন্ধুঘোটক কখন আসবে তার ঠিক কি?

ওরা বলল, না ভাই, ওরা ঠিক তিথি ধরে আসে। প্রতি মাসে প্রথম চাঁদ দেখা দিলে আমরা ঘোড়া বেঁধে দি। আজই সেই দিন। আজই সিন্ধুঘোটক আসবে।

আমার খুবই কৌতূহল হতে থাকল। ওদের সর্দার বলল, মনে হয় কালই আমরা এখান থেকে যেতে পারব। এরপর প্রায় এক মাস শূন্য পড়ে থাকবে এ দ্বীপ। ভাল সময়ে আমাদের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। আমাদের সাহায্য ছাড়া এ দ্বীপ থেকে মুক্তি পাওয়া মুস্কিল।

সারাদিন আমরা প্রতীক্ষায় রইলাম, কিন্তু সিন্ধুঘোটক এলো না। প্রথম প্রহরও আমি জেগে থাকলাম। কিন্তু আর কিছুতেই চোখ খোলা রাখা গেল না। সমুদ্রতীরেই খোলা বালুর ওপর সমুদ্র-হাওয়ায় আমি ঘুমিয়ে পড়ে সিন্ধুঘোটক দেখার সুযোগ হারালাম।

এক সময় ওদের ধাক্কায় ঘুম ভাঙ্গল। দেখলাম ওরা যাত্রার জন্য প্রস্তুত। আমি লাফ দিয়ে উঠলাম। বললাম, সিন্ধুঘোটক এসেছিল?

ওরা বলল, হ্যাঁ। আমাদের কাজ শেষ। আমরা যাত্রা করছি। তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নাও।

আমি বললাম, আমি প্রস্তুত। চল।

রাজধানীতে ফিরে এলে আমার গল্প ক্রমে সুলতানের কানে গেল। তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। দরবারে তিনি সমাদর করে তাঁর পাশে বসালেন। আমার কাহিনী বলতে বললেন। আমার জন্ম থেকে সব কথা আমি সবিস্তারে বললাম। সব শুনে তাঁর চোখে জল এলো। তিনি বললেন, আল্লা তোমার নসীবে যা

লিখেছেন তাই হবে। নিশ্চয় তিনি তোমাকে দিয়ে আরও অনেক কিছু করাবেন তাই তোমার ইন্তেকাল এত সহজে আসে নি। তুমি আল্লার দোয়া-পাওয়া লোক। তুমি ভাগ্যবান। তুমি আমার কাছেই থাক।

সুলতানের কাছেই থাকতে লাগলাম। আমি তাঁকে নানা দেশের নানা কথা শোনাতাম। এর ফলে তাঁর রাজ্য শাসনের নানা সমস্যা মিটে যেত। তিনি আমাকে তাঁর এক উজীর করে নিলেন আর আমাকে দিলেন বৈদেশিক বাণিজ্য তদারকির ভার। জাহাজ-ঘাটা থাকল আমার তত্ত্বাবধানে। আমি রাজ্যের এক প্রধান মানুষ হয়ে উঠলাম। সকালে বিকালে আমাকে না দেখলে আমার সঙ্গে গল্প পরামর্শ না করলে সুলতানের যেন দিন কাটতে চাইত না। সুখে এবং আনন্দেই দিন কাটতে থাকল।

কিন্তু স্বদেশের টান আমাকে ভেতরে ভেতরে পাগল করে তুলল। আমাদের বন্দরে ক্বচিৎ কখনও জাহাজ আসে। এলে আমার কাজ। কর নেওয়া, বাণিজ্য চুক্তি করা সবই আমার দায়। সুলতান দেখতেও চান না, শুনতেও চান না। তিনি দস্তখত করেই খালাস। এসব তো আমার দায়িত্ব। কিন্তু জাহাজ এলে এর থেকেও আমার প্রাণের টান বেশি। আমি কাপ্তেনকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করি, কাপ্তেন বাগদাদ-বসরা চেন ?

আজ্ঞে নাম শুনেছি হুজুর, যাইনি কখনও।

কোন দিকে জান ?

আজ্ঞে তাও জানি না হুজুর।

হতাশা ঘিরে ধরত আমাকে। এ কোথায় এসে পড়লাম! আর কি দেশে ফিরতে পারব না ? আজীবন এখানেই কাটাতে হবে! এমন ভাবে প্রায় দেড় বছর কেটে গেল। লোকে আমাকে ঐ রাজ্যেরই একজন ভাবতে লাগল। আমিও নানা প্রজা-হিতকর কাজে পরামর্শ দিয়ে সব দিকেই সুনাম পেলাম।

এমন সময় একদিন বন্দরে এলো এক জাহাজ। তার কাপ্তেনের

সঙ্গে কথা বলতে বলতে চমকে উঠলাম। এই তো আমার সেই জাহাজের কাপ্তেন। এ তাহ'লে আমাদের সেই জাহাজ! আমি কাপ্তেনকে বল্লাম, তোমার জাহাজে সিন্দবাদ বলে কেউ ছিল!

কাপ্তেন বল্লেন, হ্যাঁ, ছিল হুজুর। কিন্তু সে ডুবে মরে গেছে।

আমি হাসলাম। বল্লাম, না সে মরে নি। আমিই সেই সিন্দবাদ বণিক।

কাপ্তেনের মুখ গম্ভীর হ'ল। বল্ল, হুজুর, আপনি বন্দরের অধিপতি! অন্য কেউ হলে বলতাম মিথ্যাবাদী! আমি নিজে তাকে ডুবতে দেখেছি। আপনাকে বলছি, আমার সঙ্গে কেন রসিকতা করছেন হুজুর!

আমি আমার বন্ধুদের নাম বল্লাম। বল্লাম তাদের ডাকতে। তারা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরল। চিৎকার করে বলতে থাকল আমার নাম। ওরা আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে উঠল। এবার আর কাপ্তেনের সন্দেহের কিছু রইল না। সে আমাকে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে আমার সব সওদা আমাকে বুঝিয়ে দিল। আমি তার থেকে কয়েকটি বেছে নিয়ে দরবারে গেলাম। সুলতানকে সেগুলি দিয়ে বল্লাম, সুলতান, আমি যে জাহাজে বাগদাদ থেকে রওনা হয়েছিলাম সে জাহাজ আমাদের বন্দরে এসেছে। এবার আমি দেশে ফিরতে পারব!

সুলতানের মুখ কালো হয়ে গেল। তবু তিনি বললেন, যাক্ ভালই হ'ল। এতদিনে আল্লা মুখ তুলে চাইলেন!

আমি বল্লাম, মহামান্য সুলতান! আমায় তাহলে এবার দেশে ফিরবার অনুমতি দিন।

সুলতান বললেন, নিশ্চয়!

তিনি আমার বিদায় উপলক্ষ্যে মস্ত এক ভোজসভা ডাকলেন। উৎসবের আয়োজন করলেন। দেখতে দেখতে বিদায়ের দিন চলে এলো। সুলতান উপহারে-উপহারে ভরিয়ে দিলেন জাহাজ। শেষ মুহূর্তে তাঁর চোখ জলে ভরে এলো। আমি বল্লাম, জাঁহাপনা!

আর হয়ত জীবনেও আপনার সঙ্গে দেখা হবে না, কিন্তু আপনার স্নেহের যে স্মৃতি আমি বুকে নিয়ে যাচ্ছি, তা আমি জীবনেও ভুলব না।

সুলতান আমাকে দুহাত মেলে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, তোমাকে নিজের ছেলের মত ভালবেসেছিলাম সিন্দবাদ। তবু তোমাকে আটকে রাখব না। তুমি যাও। তোমার আত্মীয়েরাও তো আমারই মত বুক খালি করে আছে! আশীর্বাদ করি সুখী হও।

আমি চোখ মুছে জাহাজে উঠতে গেলাম। হঠাৎ কাঁধে হাত পড়ল। দেখলাম সুলতান এগিয়ে এসেছেন। আমার কাঁধে তারই হাত। নিজের পোষাক খুলে আমার হাতে তুলে দিলেন। বল্লেন, এ পোষাক তোমার কাছে রাখ। দেখলে আমার কথা মনে পড়বে।

আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এল। তারই মধ্যে কে একজন টেনে তুলল আমাকে জাহাজে। জাহাজ ছেড়ে দিল।

চলতে চলতে এক সময় আমরা বাসরায় পেঁ ছালাম। মন চঞ্চল। তাড়াতাড়ি বাঁধা-ছাঁদা করে নিলাম। এবার বাগদাদ। আমার স্বপ্নের বাগদাদ! আমার স্বদেশভূমি!

অনেক অর্থ নিয়ে ফিরেছি। আমার আত্মীয়স্বজনেরা সবাই ফিরে এলেন। ফিরে এলো দাস-দাসীরা। বাবার আমলের মত ঝলমল করে উঠল সব। আমি আমার সেই অছি আত্মীয়কে তাঁর পরামর্শের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে এলাম।

তিনি বল্লেন, মিরজান সুলতানদের উপহারটি খুব যত্ন করে রেখে দিও!

একজন অতিথি প্রশ্ন করল, সেটা আপনি বিক্রি করেন নি?

না। আসুন দেখাই—বলে সকলকে সিন্দবাদ নিয়ে গেলেন পাশের একটি ঘরে। সেখানে মিরজান সুলতানের পোষাক এমন ভাবে সাজান আছে যে দেখলেই মনে হয় তিনি স্বয়ং দাঁড়িয়ে আছেন।

পোষাকের সামনে সিন্দবাদ কুর্নিশ করলেন। দেখাদেখি সকলেই কুর্নিশ করল।

ফিরলেন সিন্দবাদ। বল্লেন, শুনলেন আমার প্রথম সমুদ্রযাত্রার কাহিনী। আসুন এবার আমরা খাওয়া-দাওয়া সেরে নি। হিন্দবাদ তুমিও এসো।

খাওয়া-দাওয়া সারা হলে একশ'টা স্বর্ণমুদ্রা হিন্দবাদের হাতে দিয়ে বল্লেন, কাল আবার এসো দ্বিতীয় বাণিজ্যযাত্রার গল্প বলব।

হিন্দবাদ বল্ল, আসব জনাব। কিন্তু আমাকে এত অর্থ দেওয়ার কারণ কি ?

সিন্দবাদ বল্লেন, তোমার স্পষ্টবাদিতা আমার ভাল লেগেছে। তাই তোমাকে ইনাম দিলাম।

হিন্দবাদ বল্ল, আমি মাথা পেতে নিলাম জনাব।



পরদিন সকালে হিন্দবাদ এলো সিন্দবাদের প্রাসাদে। আজ আর তার কুলির পোষাক নেই। গায়ের সাতপুরু ময়লা সে ধুয়ে ফেলেছে এক বিখ্যাত হামামে স্নান করে। অভিজাতদের মত পোষাক তার। বেশ সংকোচের সঙ্গেই দরজা ঠেলে সে বাগানে ঢুকল।

বাগানেই অপেক্ষা করছিলেন সিন্দবাদ। তিনি হিন্দবাদকে দেখেই সোল্লাসে চেঁচিয়ে উঠলেন, হো হিন্দবাদ! বন্ধু! তুমি এসেছ! তুমি তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করেছ। আমি ভীষণ খুশী হয়েছি। যারা কথা দিয়ে কথা রাখে তারা মহৎ মানুষ। বলে ছুটে এসে প্রায় জড়িয়ে ধরলেন হিন্দবাদকে।

আলিঙ্গন থেকে মুক্ত হয়ে হিন্দবাদ বলল, আপনার আতিথ্য আপনার বদান্যতা কি ভোলা যায়? তার ওপরে আছে আপনার অভিযানের গল্পের আকর্ষণ। আমাকে তো আসতে হবেই জনাব।

এ সব কথা হতে না হতেই আরও কয়েকজন আমীর ওমরাহ এসে পৌঁছালেন সেই বাগানে। তাঁরাও বললেন, হিন্দবাদ ঠিকই বলেছে। আপনার কোন কিছুরই তুলনা হয় না। আপনি যে গল্প বলেছেন তাও তুলনারহিত। কৌতূহলে রাতে আমাদের ভাল ঘুমই হয় নি।

হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন সিন্দবাদ। তিনি সকলকে ডেকে নিয়ে গেলেন গতকালের সেই কক্ষে। সেখানে বাঁদীরা মধুর গান করছিল। সেই সঙ্গীতে সবাই পরিতৃপ্ত হলেন। এমন সময় তাদের সামনে নানারকম খাদ্য-দ্রব্য সাজিয়ে দেওয়া হ'ল। সকলে নিজ নিজ খুশীমত খাদ্য নিয়ে খাওয়া শুরু করলেন। সিন্দবাদ তাদের দিকে তাকিয়ে শুরু করলেন—

শুনুন তাহলে আমার দ্বিতীয় অভিযানের কথা।

প্রথম অভিযান থেকে ফিরে এসে অতি সুখেই কাটছিল আমার দিনগুলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই আমার মনে হতে লাগল যে

তায়ে বসান ডিমের মত দিন রাত আরামে থাকতে থাকতে আমার হাত-পায়ে বুঝি খিল ধরে যাচ্ছে। আমার মনের মধ্যে কে যেন দিন রাত আয় আয় করে ডাকতে লাগল। বিশ্বময় কত অজানা বিস্ময় ছড়িয়ে আছে, তার কিছুই না দেখে জড়ের মত ঘরে বসে কাটিয়ে কি লাভ? তা হলে আমাতে পশুতে কি তফাৎ? আর স্থির থাকতে পারলাম না। আবার বাণিজ্যযাত্রার আয়োজন করলাম।

তখন সংবাদ পেলাম যে অনেক অনেক আধুনিক যন্ত্রপাতিসহ একখানা জাহাজ বিক্রি আছে। দেখতে গেলাম। ভারি পছন্দ হয়ে গেল। মালিক একটু বেশি দামই চাইল। আমি পরোয়া করলাম না, কিনে ফেললাম জাহাজখানা। গতবার গেছিলাম ভাড়ার জাহাজে, এবার নিজের জাহাজে যাত্রা করব। মন খুশিতে ভরে উঠল।

এবারে বাছাই-করা দামী দামী সওদায় বোঝাই করতে লাগলাম আমার জাহাজ। সঙ্গী ছাড়া যাওয়া যায় না। অতএব আমার পুরোন দোস্তদের সংবাদ দিতে থাকলাম। কেউ কেউ আপনা থেকেই এসে জুটল। তাদেরও প্রস্তুত হতে বললাম। আমার জাহাজে কাউকে ভাড়া দিতে হবে না। যাত্রার সব খরচ আমার।

ওরা হৈ হৈ করে রাজি হয়ে গেল। প্রস্তুত হতে থাকল সবাই। গোটা শহরে যেন একটা সাড়া পড়ে গেল।

শুভদিন দেখে আমরা যাত্রা করলাম। পাড়ে পাড়ে দাঁড়িয়ে অসংখ্য লোক আমাদের বিদায় অভিনন্দন জানাল। আমরাও আনন্দে উল্লাসে হাত নাড়তে থাকলাম। অবশেষে চেনা অঞ্চল চলে গেল চোখের আড়ালে। আমরা সমুদ্রে গিয়ে পড়লাম।

আমাদের কাপ্তেন ছিলেন চৌখশ মানুষ। তিনি সুন্দর পরিকল্পনা করে একের পর এক বন্দরে জাহাজ ভেড়াতে থাকলেন। সে-সব বন্দরে বাগদাদের মাল উচ্চ দামে বিক্রি হতে থাকল। লোকের মনের বিস্ময় কাটবার আগেই আমরা সে বন্দর ছেড়ে অন্য বন্দরে চলে যেতে থাকলাম।

চলতে চলতে এক সময় আমাদের জাহাজ এক দ্বীপে এসে থামল। দ্বীপ দেখলে জাহাজবাসী আর থাকতে পারে না। ডাঙ্গায় তাকে নামতে হবেই। আমরাও নামলাম।

নেমে আনন্দই পেলাম। চারদিকে সে কি সবুজের সমারোহ। কি সতেজ আর প্রাণবন্ত সেই দ্বীপের গাছপালা। কি কোমল তার ঘাস। কত অজস্র ফুল আর ফল। আমাদের সামনে এক ঝরণা। প্রকৃতিদেবী যেন আমাদের আপ্যায়নের জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন—সাজিয়ে রেখেছেন তার অভ্যর্থনা কক্ষ।

সবাই হৈ হৈ করে বেড়াতে থাকল। আমি ঝরণার জলে স্নান করলাম। ফল খেলাম। ওদের লাফান চেঁচামেচি শুনে দেখে খুশিতে আমার মন ভরে গেল। ঘরে থাকলে কি এ সৌন্দর্য ভোগ করতে পারতাম! পরিতৃপ্তিতে আমার দুচোখ ভরে ঘুম এলো। আমি একটুকরো সবুজ ঘাসের জমির ওপর শুয়ে পড়লাম। মাথার ওপর কি একটা গাছ পাখার মত মস্ত একটা পাতা দুলিয়ে দুলিয়ে আমাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

এক সময় চোখের ওপর রোদ এসে পড়লো গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে। তীব্র জ্বালায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। উঠে বসলাম। এ কোথায় শুয়ে আমি? ভাবতেই মনে পড়ল সব কথা। আমি খুশি মনে জাহাজের দিকে ফিরে চললাম।

কিন্তু কোথায় জাহাজ! জাহাজ কি আমাকে ফেলেই পালাল? বারবারই কি একই কাণ্ড ঘটবে! না, না, নিশ্চয় আমার ভুল হয়েছে। আমি পাড় বরাবর চলতে থাকলাম। কিন্তু না কোথাও নেই জাহাজ। আবার আগের জায়গায় ফিরে এলাম। না। আমি জায়গা ভুল করি নি। এখানেই ছিল জাহাজ। ঐ তো সকলের পদচিহ্ন। বোঝা যাচ্ছে, তারা দ্রুত দৌড়ে গিয়ে জাহাজে উঠেছে। তবে কি কোন জন্তু বা অনৈসর্গিক কিছু তাড়া করেছিল তাদের? তাই কি তারা দ্রুত পালিয়েছে! তাই কি তারা আমাকে খুঁজবার অবকাশ পায় নি! যে কারণে আর যে ভাবেই হ'ক, আমি

আবার বিজন অরণ্যে বিসর্জিত হয়েছি। আমার বুক ফেটে কান্না এলো।

কাঁদলামও। কেঁদে মন একটু শান্ত হ'ল। আমি নমাজ পড়লাম। ক্রমে আমার ঈশ্বরের ওপর আস্থা ফিরে এলো। আমি মনে মনে বল্লাম, আমি জানি না আল্লা, কি তোমার ইচ্ছা, কেন তুমি আমাকে এ বিজন অরণ্যে নির্বাসিত করলে ; তবে তুমি আমাকে যে পরীক্ষাই কর, আমি তোমার দেওয়া প্রাণ এবং মনুষ্যত্বের মর্যাদা রক্ষা করব। আমি কোন অবস্থাতেই ভেঙ্গে পড়ব না। মরবার আগে পর্যন্ত দেখব তুমি আর কোন পরীক্ষায় ফেলতে চাও।

এই সব ভাবতে ভাবতে মনে বল ফিরে এলো। আমি অবসাদ ঝেড়ে ফেলে উঠে বসলাম।

এ দ্বীপে খাবারের অভাব নেই। কিন্তু কোন পশুপাখী দেখিনি এখনও। কিন্তু কেন ? তবে কি সত্যিই এখানে কোন ভয়াল প্রাণী বা কিছু আছে ? রাত হবার আগেই এ বিষয়ে পরখ করে নেওয়া দরকার।

অতএব প্রথমেই একটা উঁচু গাছে উঠলাম। যতদূর দেখলাম সবুজ বন আর বন। সমুদ্রে অনেক দূরে দিগন্তের কাছে কালো বিন্দুর মত বোধহয় জাহাজের মাস্তুলটাই দেখা গেল। এছাড়া কোথাও কোন জনবসতি বা জনপ্রাণীর দেখা পেলাম না।

হঠাৎ অনেক দূরে পশ্চিম দিকে, কি একটা বস্তু ঝক্‌মক্ করছিল, তার দিকে নজর গেল। কি হতে পারে! চোখ কুঁচকে দেখতে চেষ্টা করলাম। বিশাল সাদা একটা কিছু। কি হতে পারে! নিশ্চয় প্রাসাদ। কিন্তু গম্বুজ নেই, মিনার নেই, কেমন প্রাসাদ ?

গাছ থেকে নেমে ছুটলাম সেই প্রাসাদের দিকে। যতই এগুতে থাকলাম, ততই বস্তুটি আমাকে বিস্মিত করতে থাকল। ঐ প্রাসাদের দেওয়ালে কোথাও কোন জানালা নেই, খাঁজ নেই, গম্বুজ নেই, কিছু নেই। কাছে গিয়ে চারদিক ঘুরে ফিরেও ঐ প্রাসাদে ঢুকবার কোন দরজা-সিঁড়ি বা সুড়ঙ্গ পেলাম না। কোথাও কোন প্রহরী বা রক্ষীও

নেই। অথচ শ্বেতপাথরের পালিশের চাইতেও মসৃণ তার গা। আর কি বিচিত্র তার গড়ন। মাটির ওপর থেকে ক্রমেই গোল হয়ে ওপরে উঠে গেছে। ওপর দিকটাও ঠিক সমান পরিমাণে গোল। যেন তু'টো বাটি মুখোমুখি এঁটে দিয়েছে কেউ। এত সুন্দর জোড় মিলিয়েছে যে বুঝবার উপায় নেই কোথায় জোড়।

কিন্তু এই বিজন অরণ্যে এমন অদ্ভুত প্রাসাদ বানাল কে? কি উদ্দেশ্যেই বা তৈরী হল এ প্রাসাদ! আমাদের তিনতলা উঁচু প্রাসাদের চেয়ে বড়-বই ছোট হবে না। আমি চারদিকে ঘুরে মাপলাম। ওটা এক পাক ঘুরতে আমাকে একশ' পঞ্চাশ বার পা ফেলতে হ'ল।

আমি কতক্ষণ ধরে ঐ প্রাসাদটা পর্যবেক্ষণ করছিলাম তা মনে নেই। হঠাৎ আকাশ অন্ধকার হয়ে এলো। তবে কি সূর্য অস্ত যাচ্ছেন? রাত হয়ে এলো? না। ঐ তো ওপাশে রোদ। তবে কি আকাশে ঘন মেঘের আড়াল পড়েছে! না, তাও নয়। এই তীব্র গ্রীষ্মে অত ঘন মেঘ আসবে কোথা থেকে? আমি তাড়াতাড়ি প্রাসাদের আড়াল থেকে উঁকি মারলাম।

আকাশের দিকে তাকিয়ে আমি চমকে উঠলাম। একটা বিশাল পাখি যেন সূর্যকে ঢেকে দেওয়ার সংকল্প নিয়ে ওপরে ঘুরপাক খাচ্ছে।

তখন হঠাৎ মনে পড়ল, নাবিকদের কাছে এক রকম বিশাল পাখির বর্ণনা শুনেছিলাম। এক একটা পাখি যেন এক একটা পাহাড়। সেই জন্যই তাদের নাম রকপাখি। এতদিন এ সব কথা বিশ্বাস করিনি। এবার মনে হ'ল আমি তাহলে রকপাখির দেশেই এসে পড়েছি। এ জন্যই এখানে পশুপাখি নেই। আর এই পাখির ভয়েই তাহলে জাহাজের লোকেরা পালিয়েছে। এবার ধাঁ করে আমার মনে ঝলকে উঠল, তাহ'লে এটি তো কোন প্রাসাদ নয়—এটি রকপাখির ডিম। সেইজন্যই এতে কোন প্রবেশপথ পাইনি। আর ওপরের রকটি নিশ্চয় এখানে নেমে আসবে।

ভাবতে না ভাবতে আমার সামনে এসে থামল রকপাখির একটি পা। ওরে বাবা! কি বিশাল পা। নখগুলি দেখে মনে হচ্ছে পাহাড়ের খাত! মাঝখান দিয়ে বুঝি নদী বইত। এখন শুকিয়ে গেছে। পায়ের গোছাটা বাদশার বাড়ির থামের মত। পালকগুলিই বা কত বড়।

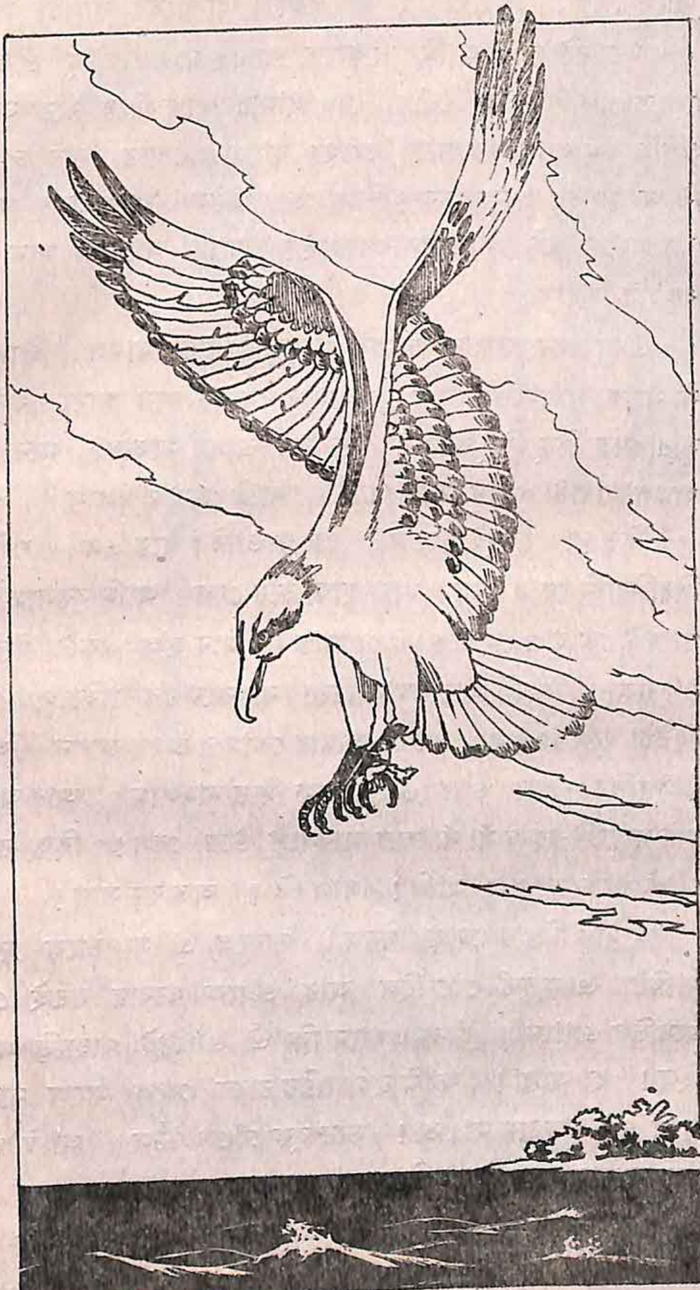
হঠাৎ মাথায় এক বুদ্ধি এলো। এ রক খানিকক্ষণ এখানে বসে থেকে আবার উড়বে। সে যাবে দ্বীপান্তরে। আমি যদি কোনক্রমে রকের ওপর চড়ে বসতে পারি তবে এ দ্বীপ থেকে অবশ্য পার হওয়া যাবে। চিন্তাটা মাথায় চেপে বসল।

কিন্তু কিভাবে রকের পিঠে চাপা যায়? সে-সুযোগ কোথায়! ইনি তো আমার পোষা জীব নন্ যে আমি চেপে বসব। বরং ভয়ই আছে। আমার অস্তিত্ব জানলে এ জীবটি তার এক নখের খোঁচায় বা ঠোঁটের ঠোক্করে শেষ করে দিতে পারে। তবে কিভাবে একে ব্যবহার করে এই বিজন দ্বীপ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়?

ভাবতে ভাবতে এক ফন্দি এলো মাথায়। আমি মাথার পাগড়ি খুললাম। ঐ থামের মত পায়ের চারপাশ ঘুরে ঐ কাপড় দিয়ে একটা গিঁট বাঁধলাম। মনে ভয় ছিল গিঁট বাঁধলেই বুঝি পাখিটা নড়ে উঠবে। না। ঐ চাপটা পাখিটার কাছে এত সামান্য যে ও তা টেরও পেল না। আল্লাকে ধন্যবাদ দিলাম। এবার আর কেউ আমাকে এখান থেকে অন্যত্র পাড়ি দিতে বাধা দিতে পারবে না। আমি পাগড়ির অন্যপ্রান্ত আমার কোমরে আচ্ছা করে জড়িয়ে বেঁধে নিলাম। এবার প্রতীক্ষা কতক্ষণে পাখিটা ওড়ে।

এবার পাখি উড়ল। প্রচণ্ড গতিতে বাতাস কেটে উঠতে থাকল পাখিটা। আমার বুকের ভেতর কেমন করে উঠল। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। শরীরের সব রক্ত যেন নেমে যাচ্ছে পায়ে আমি তাড়াতাড়ি রকের নখের ওপর ঘোড়ায় চড়ার মত বসলাম। এবার খানিকটা সুস্থ মনে হল।

আমার ইচ্ছে করতে লাগল, এত ওপর থেকে পৃথিবীকে কেমন



লাগে দেখি। কিন্তু চোখে এত জোরে বাতাসের ঝাপটা লাগছে যেন ঝড় বইছে। আমি তাকাতে পারছি না। যেটুকু তাকাচ্ছি, তাতে দেখছি ধোঁয়া ধোঁয়া মেঘ আমার পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। আমি রক পাখির কল্যাণে মেঘের রাজ্যের ভেতর দিয়ে চলেছি। ঐ অবস্থাতেও আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। পৃথিবীতে আমার আগে কে এই সৌভাগ্য পেয়েছে! আমি আল্লাকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম।

এমন সময় হঠাৎ রকটি যেন একমুহূর্তের জন্য থামল। তারপরই সাঁ সাঁ করে নামতে থাকল। আমার দম বন্ধ হয়ে আসতে থাকল। সারা দেহ শির্ শির্ করে সব রক্ত উঠে এলো মাথায়। মনে হতে থাকল মাথাটা এখুনি ফেটে যাবে। আমি চোখ বুঁজলাম।

কিন্তু না। কিছুই হ'ল না। দম স্বাভাবিক হয়ে এল। শরীরের শিরশিরানি থেমে গেল। মাথা হাল্কা হয়ে গেল। আমি বুঝলাম রক-পাখিটি কোথাও নেমেছে। কোথায়? মনে হ'ল একটা পাহাড়ি উপত্যকা। আমি আর কোন চিন্তা না করে রকপাখির পা থেকে গিঁটটা খুলে দিলাম। তখনও আমার কোমরে চাদর জড়ান। আমি রকপাখির নখের ওপর থেকে লাফ দিয়ে নামলাম। আর আশ্চর্য সেই মুহূর্তেই রকটি সাঁ সাঁ করে আকাশে উড়ে গেল! কিন্তু রকের ঠোঁটে ওকি দেখলাম আমি! সাপ কি? অত বড় সাপ!

আমার চিন্তার মোড় ফিরল। তাহলে ঐ সাপটাকে দেখেই পাখিটা একমুহূর্ত থেমেছিল আর ওটাকে ধরবার জন্যই নেমে এসেছিল এখানে। কিন্তু এখানে কি ঐ একটাই পাহাড়ি ময়াল ছিল! হা আল্লা! আমি রকপাখির রাজ্য থেকে ময়াল সাপের দেশে এসে পড়লাম না তো! ভয়ে বুক কেঁপে উঠল। আমি ভাল করে আমার অবস্থা বুঝে নিতে চাইলাম।

যতই আমি চারদিকে তাকাতে থাকলাম, ততই আমার বুক কেঁপে উঠতে থাকল। এটা একটা পাহাড়ি উপত্যকা গোছের জায়গা। চারদিকে এত উঁচু পাহাড়, যেন কেউ ইচ্ছে করে এখানে



একটা মস্ত পাহাড়ি গহ্বর তৈরী করেছে। সে পাহাড় বেয়ে ওঠা মানুষের পক্ষে অসাধ্য।

উপত্যকার কোনদিকে আমি কোন গাছ-পালা নদী-নালা দেখতে পেলাম না। হা আল্লা, এ কোথায় আনলে আমায়। আগের দ্বীপে ত' জল আর ফলমূলের অভাব ছিল না। এখানে কোথায় খাবার! কোথায় জল! অন্যভাবে যদি নাও মারা যাই, তো খাবার-জলের অভাবেই মরতে হবে!

উপত্যকার ভেতরে এমনিতেই অন্ধকার! ক্রমে আরও অন্ধকার হয়ে আসছে। পুরো অন্ধকার হবার আগেই আমার রাতের আবাস ঠিক করে নিতে হবে। একথা ভেবে দু-এক পা এগুতেই যা দেখলাম, তাতে আমার চোখ স্থির হয়ে গেল। আমি একেবারে মৃত্যু-গহ্বরে এসে হাজির হয়েছি। এর প্রায় চারদিক থেকেই হাজার হাজার সাপ বেরিয়ে আসছে। ওদের যে কোনটির নিশ্বাসের আওতায় পড়লেই যে একটানে হাঁর ভেতর ঢুকিয়ে নেবে! আমার গায়ের রক্ত হিম হয়ে আসতে থাকলো। বুঝলাম রকপাখির ভয়ে ওরা পাহাড়ের গহ্বরে লুকিয়ে থাকে। যতই অন্ধকার হয় ততই বেরিয়ে আসে।

হঠাৎই একটা ছোট গুহা নজরে পড়ল। আমার মত একটা লোক কোনক্রমে তার ভেতরে ঢুকে থাকতে পারে। না, এটা কিছুতেই কোন সাপের আবাস হতে পারে না। ওরা এতবড় যে ওদের একটার আধখানাও এতে ঢুকবে না। গুহাটা পেয়ে অনেক স্বস্তি বোধ করলাম। এবার ওর মুখ ঢাকবার একখানা পাথর দরকার। একটু খুঁজতে তেমন পাথরও একটা পাওয়া গেল। আমি আর অপেক্ষা না করে ঐ গুহায় ঢুকে, পাথরখানা দিয়ে বন্ধ করে দিলাম মুখটা। গুহার মধ্যে রাত্রি নেমে এলো।

বাইরেও রাত নামতে দেরি হ'ল না। কিন্তু একি! আমার গুহার মধ্যে কিসের নিশ্বাস পড়ল! ততক্ষণে অন্ধকার চোখ সয়ে এসেছে। চোখ বড় করে তাকিয়ে দেখতে চেষ্টা করলাম। কি সর্বনাশ! যাকে গুহার শেষ প্রান্তের বড় কালো পাথরের চাঁই

ভেবেছিলাম, আসলে সেটা একটা ময়াল সাপ। বোধ হয় কুণ্ডলি পাকিয়ে ডিমে তা দিচ্ছিল, এবার খাবারের সন্ধানে যাবার জন্য জেগে উঠেছে। আমি ওর চোখ তুটো জ্বল জ্বল করতে দেখলাম। এবার এই সংকীর্ণ গুহার মধ্যে ওর হাত থেকে কে আমাকে রক্ষা করবে? বাইরে হাজার সাপের ফোঁসফোসানি আর ভেতরে এক ক্ষুধার্ত ময়ালের জেগে ওঠা—আমি আর ভাবতে পারলাম না। জ্ঞান হারালাম।

যখন জ্ঞান ফিরল, চোখ মেললাম, তখন এই ভেবে আশ্চর্য হলাম যে, তখনও আমি ময়ালের পেটের মধ্যে নেই কেন! তবে কি কাল ময়ালটি আমাকে কৃপা করে খায় নি! কিন্তু কেন? দেখলাম সামনের মুখ বন্ধ-করা পাথরটা খোলা। বোধ হয় গুহার মুখ বন্ধ দেখে ক্রুদ্ধ ময়াল ওটাকেই প্রধান শত্রু ভেবে এগিয়ে গেছে। ঠেলে বাইরে চলে গেছে। পাশে পড়ে থাকা আমাকে হয়ত লক্ষ্যই করেনি। আমি আল্লাকে আর একবার কৃতজ্ঞতা জানালাম।

ততক্ষণে বাইরে রোদের বন্যা বইছে। ক্ষুধায় তৃষ্ণায় শরীর ক্লান্ত। এখন ত সাপের ভয় নেই। খাদ্য জল সংগ্রহ করতে হবে। পালাবার পথ দেখতে হবে। দিনের সময় অপচয় করলে চলবে না। তাড়াতাড়ি বাইরে এলাম।

কিন্তু এ কোথায় এলাম! চারদিক অজস্র মণিমুক্তায় ঝলমল করছে। রাতে যেগুলিকে নুড়ি-পাথর ভেবেছিলাম, আসলে তা এক একটা হীরে। তাহ'লে আমি কি সেই বিখ্যাত হীরক-গহ্বরে এসে পড়েছি?

এমন সময় ধপ করে কি একটা পড়ল আমার সামনে। আমি দ্রুত পিছিয়ে এলাম। একটুর জন্য ওটা আমার মাথায় পড়েনি। কি ওটা! দেখলাম একটা ছাল-ছাড়ান ভেড়ার চার ভাগের এক-ভাগ কে ফেলেছে ওপর থেকে।

ঐ মাংস-পিণ্ড দেখে মনে পড়ল এই হীরক-গহ্বরের কথা যে বণিক বলেছিল তার বর্ণনা। সে বলেছিল, এখানে নামা সম্ভব নয় বলে একদল লোক ওপর থেকে এমনি মাংসের টুকরো নিচে ফেলে

দেয়। হীরের ওপরে অত উঁচু থেকে পড়লে মাংসের গায়ে হীরে গেঁথে যায়। আর একদল পাখি সেই মাংস ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নিজের বাসায় বসলেই লোকগুলো তাড়া করে পাখিকে। পাখির বাসায় মাংসে গাথা হীরে পায় লোকগুলি।

গল্পটা আমাকে মুক্তির পথ বলে দিল। আমি তাড়াতাড়ি বেছে বেছে বড় বড় হীরেতে ভরিয়ে ফেললাম আমার কুর্তা। তারপর পাগড়ির একপ্রান্ত মাংসের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে অন্যপ্রান্ত বেঁধে নিলাম নিজের কব্জীতে। আর অপেক্ষা করতে থাকলাম, কতক্ষণে পাখিতে ছোঁ মারে!

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না। রক পাখির চেয়ে কিছু ছোট জাতের এক রকম পাখি এসে ছোঁ মেরে তুলে নিল মাংসখণ্ড। আমিও তার সঙ্গে ঝুলতে ঝুলতে চললাম।

গহ্বর থেকে ওপরে উঠতেই একদল লোক তাড়া করল পাখিটাকে। বেয়াড়া পাখিটা তবু নাছোড়বান্দার মত উড়ল তার বাসার দিকে। কিন্তু মজা হ'ল এই যে ওর বাসায় ও যখন পৌঁছাল তার আগেই আমি পৌঁছেছি। আমি হাতের বাঁধন খুলতে না খুলতে পাখিটা নেমে এলো। আমি লুকোবার অবকাশ পেলাম না। মনে হ'ল পাখিটা এবার আমাকে ছিঁড়ে টুকরো করে ফেলবে। কিন্তু পাখিটা সে অবকাশ পেল না। জহুরীর দল হৈ হৈ করে তেড়ে এলো। পাখিটা পালাল। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

কিন্তু হাঁফ ছাড়া বুঝি আমার কপালে নেই। পাখিটা চলে যেতেই একটা লোক গাছের ডালে চড়তে চড়তে আমাকে চোর ডাকাত শয়তান—এসব বলে গালাগালি দিতে থাকল।

আমি বল্লাম, গালি দিচ্ছ কেন বাপু?

লোকটা বল্ল, গালি দেব না তো কি পুজো করব! আমাদের হীরে চুরি করতে উঠেছ তুমি।

আমি বল্লাম, না। আমি চোর নই। হীরে চুরি করতেও উঠি নি। আগে গাছ থেকে নামো তারপর তোমাকে সব বলছি।

বলাচ্ছি তোমাকে! বলে লোকটি আমাকে নিয়ে হাচড় পাচড় করে নামল। নেমে গিয়ে এক তাঁবুর সামনে দাঁড়াল। বল্ল, শেখ সাহেব বাইরে আসুন। হীরে চোর ধরেছি।

পাকা দাড়ি পাকা চুল এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন তাঁবু থেকে। বল্লেন, কে চুরি করেছে!

লোকটা আমাকে ঠেলে দিল।

আমি বল্লাম, আমি চোর নই জনাব। আমি একজন সৎ বণিক। ভাগ্যচক্রে হীরে গহ্বরে ঢুকে পড়েছিলাম। আপনার লোকদের ফেলা মাংসখণ্ডের সঙ্গে পাখিটা আমাকে তুলে এনেছে। আপনার লোকটি আমাকে দেখেই গালাগাল করে টেনে এনেছে। খুঁজলে আপনি আপনার ফেলা মাংসখণ্ডে হীরে এখনও পাখির বাসায় পাবেন।

বৃদ্ধ শেখ সঙ্গে সঙ্গে অন্য লোক পাঠালেন পাখির বাসায়। সত্যিই সেখানে মাংসখণ্ডে হীরেগুলো পাওয়া গেল। তখন তার লোকটির হয়ে শেখ আমার কাছে ক্ষমা চাইলেন। বল্লেন, মেহেমান! আমার লোককে ক্ষমা করুন। আপনি বলুন কিভাবে আপনি ঐ হীরে গহ্বরে গেলেন, কিভাবেই বা উদ্ধার পেলেন?

আমি তাঁকে সব গল্প বল্লাম। বলে তাঁকে একটি হীরে উপহার দিলাম। সে হীরে দেখে তাঁর এবং অন্যদেরও চোখ কপালে উঠল। তিনি বল্লেন, এত বড় হীরে আমি জীবনেও দেখিনি। আপনি এত বড় হীরে আমায় দিলেন! এ যে সাতপুরুষ বসে বসে খাওয়ার মত সম্পদ।

আমি হাসলাম। বল্লাম, ওরকম হীরে আমার কাছে কয়েক শ' আছে। আপনি ইচ্ছে করলে—

শেখ আমাকে থামিয়ে দিয়ে বল্লেন, না বেটা। আমার দরকার নেই। আমি বুড়ো হয়েছি, আমার ছেলেমেয়ে নেই। কি হবে আমার সম্পদে! আমি তোমার যে গল্প শুনলাম তা অনেক বড় সম্পদ। তোমার মত নির্ভীক, বিপদে মতিস্থির রাখা মানুষ দেখলাম —এ আমার সবচেয়ে বড় সঞ্চয়।

এই বলে শেখ আমাকে আদর করে তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে নতুন পোষাক দিলেন। স্নান করালেন, খাবার দিলেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর চেষ্টাতেই আবার আমি এক জাহাজে চড়ে বসলাম। অনেক ঘুরে এলাম বসরায়। তারপর ফিরে এলাম বাগদাদে।

আমাকে পেয়ে আমার আত্মীয়-স্বজনের সে কী আনন্দ। আমার দু-একজন যাত্রাসঙ্গী অন্য জাহাজে ফিরে এসেছিল। তারা জানাল যে, তারা রক পাখির তাড়াতেই পালিয়েছিল। ওরা আমাকে ফেলে আসার জন্য বারবার ক্ষমা চাইতে লাগল। আমি ওদের বল্লাম, তোমরা যে বেঁচে ফিরেছ, এতেই আমি খুশি।

অভ্যাগতেরা বল্লেন, আপনার গল্পের মত আপনার মহত্ত্বেরও তুলনা হয় না।

সিন্দবাদ হো হো করে হাসলেন। বল্লেন, আপনারা ওভাবে প্রশংসা করবেন না। আসলে আমি জীবনে এতবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েছি যে আমি জানি সামনে মৃত্যু দেখলে সাধারণ মানুষ কেমন বুদ্ধি-শুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। অথচ মনের জোরে রুখে দাঁড়ালে মৃত্যুকেও জয় করা যায়। আমার বন্ধুরা তো সাধারণ মানুষ। ওরা আমাকে তো ইচ্ছে করে ফেলে আসে নি। নিজের প্রাণ বাঁচাতে ভয়ের তাড়নায় ফেলে এসেছে। ওদের ক্ষমা করব না!

অভ্যাগতেরা বল্লেন, আমরা আপনার কাছে ক্ষমার এক মহৎ শিক্ষা পেলাম।

গল্পে গল্পে রাত হয়ে এলো। সিন্দবাদ সেই হীরে-গহ্বর থেকে আনা একখণ্ড মস্ত হীরে ওদের দেখালেন। ওরাও বিস্মিত চোখে সেটি দেখতে থাকল।

সিন্দবাদ আজও হিন্দবাদকে একশ' মোহরের একটি তোড়া উপহার দিলেন এবং সকলকে আগামীকাল সকালে উপস্থিত হবার জন্য আমন্ত্রণ করলেন। সকলে সম্মত হয়ে ফিরে গেলেন।

সিন্দবাদের গল্পের আকর্ষণ হিন্দবাদকে খুব ভোরেই টেনে আনল সিন্দবাদের প্রাসাদে। আজও সিন্দবাদ তাকে প্রাসাদ দ্বারে অভ্যর্থনা করলেন। প্রথম দু'জনে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুলের সৌন্দর্য এবং সুবাস উপভোগ করতে থাকলেন। ক্রমে ক্রমে অন্য অতিথিরা এসে জমায়েত হতে থাকলেন। এখন সিন্দবাদ সকলকে নিয়ে এলেন অভ্যর্থনা কক্ষে।

অন্যদিনের মত আজও বাঁদীরা গান গাইল। তারপর সাজিয়ে দিল খাবার। সাধারণ গল্প-গুজবে নাস্তা শেষ হল। পান তামাক নিয়ে সকলে মৌজ করে বসলেন। এবার শুরু হ'ল সিন্দবাদের গল্প বলা।

সিন্দবাদ বলতে শুরু করলেন—

আমার দ্বিতীয় সমুদ্রযাত্রার কথা আপনারা শুনেছেন। এমন বিপদে পড়েও আমি যে আবার আত্মীয় পরিজনের মধ্যে ফিরে আসতে পেরেছিলাম, সে শুধু আল্লার অসীম করুণায়। দেশে ফিরে কিছুদিন আনন্দ উপভোগ করে আমি সব বিপদের কথা ভুলে গেলাম। সমুদ্রযাত্রায় প্রতিবারই তো আর বিপদ ঘটবে না! তাহ'লে এত লোক নিয়ত সমুদ্রযাত্রা করবে কেন! এই সব ভেবে আবার সমুদ্র-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

এবারে সঙ্গীদল বদল করলাম। একদল খানদানী বসরাই সওদাগর এবার আমার সঙ্গী হলেন। আমার সওদাও এবার স্বতন্ত্র। এবার নিলাম আরবের বিখ্যাত আতর আর সুগন্ধী নির্যাস। আর নিলাম সূক্ষ্ম কারুকার্য করা গহনা। বন্দরে বন্দরে আমার সওদা কিনতে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। অন্য সওদাগরেরা বলতে থাকলেন, আচ্ছা ভাগ্য করে এসেছিলে শেখ। এবারে ব্যবসা যাকিছু সব তোমারই।

এমনি করে মুসলমান রাজত্ব ছাড়িয়ে আমরা মাঝ-সমুদ্রে চলে এলাম। পালে হাওয়া লেগে তরতর করে চলতে লাগল জাহাজ। আমরা সবাই মনের আনন্দে গান গাইতে থাকলাম। কেউ কেউ নানারকম খেলা শুরু করল। মোট কথা সেই মাঝদরিয়াতেও আমরা স্ফূর্তিতে দিন কাটাতে থাকলাম।

এই সময় একদিন মাস্তুলের ওপরের দিশারী মল্লা নেমে এসে কি যেন বল্ল কাপ্তেনকে। সে সঙ্গে সঙ্গে মাস্তুলে উঠে গেল। কি দেখল সেই জানে। দেখেই হাউ হাউ করে কাঁদতে শুরু করল। বল্ল, সর্বনাশ হয়েছে। আমরা কেমন করে যেন বাঁদর-দ্বীপের কাছে চলে এসেছি।

আমরা বল্লাম, বাঁদর দ্বীপে এলে কাঁদবার কি আছে। আমরা মানুষ। বাঁদরকে কি ভয়!

কাপ্তেন বল্ল, এরা আমাদের দেখা বাঁদর নয়। এরা ভীষণ হিংস্র। আর তাছাড়া কেন জানি না এখন স্রোতের টানে নৌকা বাঁদর দ্বীপে যাবেই।

সত্যিই তাই। আমরা সকলে মিলে দাঁড় বেয়েও জাহাজকে অন্যদিকে নিতে পারলাম না। জাহাজ ক্রমেই বাঁদর দ্বীপের দিকে এগিয়ে চল্ল। আমরা আতঙ্কে আগামী বিপদের জন্য অপেক্ষা করতে থাকলাম।

বাঁদর দ্বীপের কাছাকাছি আসতেই শত শত বাঁদরের চিৎকারে আমাদের কান ফেটে যেতে থাকল। দেখলাম ওরা সার বেঁধে তীরে দাঁড়িয়ে বিকট অঙ্গভঙ্গি করে উত্তেজনায় চিৎকার আর আস্ফালন করছে। যেন আমাদের পাওয়া মাত্র ছিঁড়ে খেয়ে ফেলবে। আমাদের দু-একটা যা গাদাবন্দুক আছে তা শত শত বাঁদরের কাছে অর্থহীন। কি ভাবে আত্মরক্ষা করা যায়? অবশেষে সকলে মিলে জাহাজের খোলে আশ্রয় নিলাম। খোলের মুখ বন্ধ করে দেওয়া হল।

সেখান থেকে বুঝলাম, জাহাজ গিয়ে বাঁদর দ্বীপে লাগল।

বাঁদরেরা দলে দলে জাহাজে উঠল। এদিক-ওদিক লাফাল এবং ভাঙ্গচুরের আওয়াজ আসতে থাকল। আমরা আল্লাকে ডাকতে থাকলাম। ওরা যেন আমাদের সন্ধান না পায়।

কিন্তু আমাদের সে আবেদন বুঝি আল্লার কানে পৌঁছাল না। ওরা পাটাতন ভেঙ্গে আমাদের সন্ধান বের করল। তারপর আমাদের ধরে ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে থাকল ডাঙ্গায়।

এমনি করে আমাদের সবাইকে ডাঙ্গায় ফেলে ওরা জাহাজ দখল করল। তারপর উল্লাসে সকলে মিলে উঠল জাহাজে। তখন আরও বাঁদর কোথা থেকে ছুটে আসতে থাকল। সকলেই গিয়ে উঠতে থাকল জাহাজে। কত বাঁদর যে জাহাজে উঠল তার সীমা নেই। আমাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় তারা আমাদের ভ্রূক্ষেপও করল না। কি যে তাদের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝলাম না আমরা।

হঠাৎ দেখলাম সমুদ্রের স্রোতের গতি বদলে গেল। জাহাজটা চলতে শুরু করল। তখনও ডাঙ্গায় ছিল যে বাঁদরেরা তারা জোর ছুটল্ জাহাজে উঠতে। কেউ কেউ জলে ঝাঁপিয়েও পড়ল। কিন্তু ততক্ষণে জাহাজ তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে। তখন অবশিষ্ট বাঁদরেরা হু-হু করে আর্তনাদ করতে করতে আবার ছুটে বনের মধ্যে লুকিয়ে পড়ল।

কি যে ব্যাপার ঘটল তা আমরা কিছুই বুঝলাম না। শুধু বুঝলাম যে আমরা বাঁদর দ্বীপে বিসর্জিত হয়েছি। আমাদের জাহাজ বাঁদরদের কবলে। কিন্তু জাহাজ নিয়ে কি করবে বাঁদরেরা? ওরা অমন করে আগ্রহে জাহাজে উঠছিল কেন? যারা উঠতে পারল না, তারা কাঁদতে কাঁদতে পালালই বা কেন? কিছুই বুঝে উঠতে পারলাম না।

যা হোক, বসে থেকে লাভ নেই। যে অবস্থায় পড়েছি, সেখান থেকে কি করে উদ্ধার পাওয়া যায় তা ভাবতে হবে। ভাগ্য ভাল, আমাদের ডাঙ্গায় ছুঁড়ে ফেলা ছাড়া বাঁদরেরা আর কিছুই করেনি। প্রাণকে সম্বল করে আমরা প্রাণ বাঁচাবার চেষ্টা করতে ব্যস্ত হলাম।

সবাই সেখানে বসেই আমাদের কর্তব্য স্থির করে নিলাম। প্রথমেই চাই আশ্রয়। এজন্য উঁচু গাছে উঠে চারদিক দেখে নেওয়া দরকার। একজন গাছে উঠেই চিৎকার করে উঠল। কাছেই এক প্রাসাদ। মস্ত প্রাসাদ। কিন্তু কোন লোকজন দেখা যাচ্ছে না।

না যাক। আমরা সবাই মিলে সেদিকে ছুটে গেলাম। প্রাসাদে প্রবেশ করবার আগেই আমরা থামলাম। চারদিকে সুন্দর ফুল-ফলের বাগান। সুন্দর দীঘি। আমরা স্নান করলাম। ফল খেলাম। তারপর সুস্থ হয়ে প্রাসাদের সিংহদরজার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

সিংহদরজার উচ্চতা প্রায় তালগাছের সমান। দরজাগুলিও তেমন। কি জানি কি খেয়ালে কে এত বড় বড় দরজা তৈরী করেছিলেন। আমরা সিংহদরজা দিয়ে ঢুকে সামনেই এক মস্ত বড় হলঘর পেলাম। কে জানে বাবা কি কাজ হত এখানে! ঢুকলাম সেখানে।

ঢুকেই দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। কিসের দুর্গন্ধ! নাক চেপে তাকালাম সামনে। ঘরের সর্বত্র হাড় ছড়ান। কতকগুলি শুকিয়ে সাদা হয়ে আছে। কতকগুলিতে এখনও মাংস লেগে আছে। এক কোণায় একটা মস্ত উনুন। তাতে মস্ত এক কড়াই চাপান। এ যেন রান্নাঘর আর শ্মশান, একসঙ্গে করা হয়েছে।

হঠাৎ আমার নজর পড়ল এক কোণায়। সেখানে একটা বাঁদরের তাজা মুণ্ডু পড়ে আছে। কিন্তু কেন? এখানে কি বাঁদরের চেয়েও হিংস্র কেউ আছে? তারই ভয়ে কি বাঁদরেরা অমনি করে নিরুদ্দেশ সমুদ্রে পাড়ি দিল? যারা যেতে পারল না তারা কি ঐ ভয়েই অমনি করে অরণ্যে লুকিয়ে পড়ল? তবে কি সেই ভয়ের জিনিসের প্রাসাদেই আমরা ঢুকে পড়েছি! একি তারই রান্নাঘর! সে কি এ কড়াতেই রেঁধে খায়! সর্বনাশ!

আমি আমার বন্ধুদের ডেকে আমার আন্দাজের কথা বলতে গেলাম। কিন্তু তার আগেই দরজা ঠেলে ঢুকল এক বিশালকায়



দৈত্য। এতক্ষণে বোঝা গেল, দরজাগুলি কেন অত উঁচু। সেই দরজা দিয়েও মাথা নিচু করে ঢুকতে হল তাকে। কী কদাকার মুখ! আগুনের ভাঁটার মত দুটো চোখ। মস্ত মস্ত দাঁত। অনেকটা কুকুরের দাঁতের মত। নিচের ঠোঁটটা ঝুলে পড়েছে অনেকখানি।

এবার দেখলাম, তার হাতে ঝোলান রয়েছে একটা বাঁদরের দেহ। সে আমাদের দেখে হো হো করে হেসে উঠল। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দিল বাঁদরটাকে। তারপর ছোঁ মেরে ঘাড় ধরে তুলে নিল আমাকে। আমি একটা ইঁদুর ছানার মত দুলতে থাকলাম তার হাতে। বুঝলাম আর আমার নিস্তার নেই। এখুনি সে ঐ বাঁদরটির বদলে আমাকে দিয়েই তার আজকের আহার সারবে। তার আগে সে নিশ্চয় ঐ কড়াইতে আমাকে সেদ্ধ ভাজা করে আচ্ছা খানা পাকাবে। আমার হাসি পেতে থাকল। আর একটু পরেই আমার হাত-পা মাথা-দেহ প্লেটে প্লেটে সাজান হয়ে যাবে। দৈত্য তার বন্ধুদের ডেকে হয়ত....

আমি শুধু ভাবতে থাকলাম, দৈত্যটা যেন আমাকে জ্যান্ত কড়াইতে না ফেলে। আগে যেন আমাকে হত্যা করে তবে তার খাবার বানায়।

আমি যখন দৈত্যের হাতে দুলতে দুলতে এসব ভাবছি, ততক্ষণ দৈত্য বোধ হয় আমাকে পরখ করে দেখল, তারপর আমাকে ধপ করে ফেলে দিল। বোধ হয় আমাকে তার পছন্দ হল না। শীর্ণ দেহ হওয়ায় সাক্ষাৎ মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেলাম।

এরপর সে আমার মত চার পাঁচ জনকে তুলে তুলে পরীক্ষা করল, কাউকেই বোধহয় পছন্দ হল না তার। শেষ পর্যন্ত তুলে নিল আমাদের কাপ্তেনকে। কাপ্তেন মোটা-সোটা লোক। তাকে তুলে দৈত্যর মুখে খুশির হাসি ফুটে উঠল।

কাপ্তেন চিৎকার করে বল্লেন, বন্ধুরা! আমার এখুনি মৃত্যু হবে। বিদায়! বলেই সে এক অবাক কাণ্ড করল। সে তার কোমর থেকে তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে দৈত্য কিছু বুঝে

উঠবার আগেই তার কপাল-নাক-ঠোঁটের ওপর দিয়ে এক কোপ লাগাল।

দৈত্য যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠল। রাগে সে ছুঁড়ে ফেলল কাপ্তেনকে। তিনি ঘাড় মুচড়ে এমন ভাবে পড়লেন যে সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হ"ল। কিন্তু মরবার আগে কাপ্তেন আমার বুকে দাগ কেটে লিখে গেলেন যে, মরবার আগেও প্রতিবাদ না করে অসহায় ভাবে মরবে না। আমি মনে মনে কাপ্তেনকে আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জানালাম।

অল্প সময়ের মধ্যেই দৈত্যটা তার ক্ষতস্থানের রক্ত মুছে উনুনটা জ্বালিয়ে ফেলল, তারপর কাপ্তেনের দেহটাকে ফেলে দিল কড়াইতে। বেশ খানিকক্ষণ ফুটিয়ে সে সেই সেদ্ধ মাংস বেশ তারিফ করে খেল। হাড়গুলো চুষে চুষে ফেলতে লাগল চারদিকে। আমরা ভয়ে আতঙ্কে এক কোণে জড়ো হয়ে অপেক্ষা করতে থাকলাম।

খাওয়ার পরে দৈত্যটা আমাদের দিকে তাকালও না। পাশে একটা মস্ত বড় কাঠের পাটাতন ছিল তার ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

আমরা কেউ নড়াচড়া করলাম না। যদি দৈত্যের ঘুম ভেঙ্গে যায়—এই ভয়ে চুপ করে রইলাম। সারারাত ঘুমালো দৈত্যটা। ভোরবেলা উঠেই বেরিয়ে গেল সে।

এই সুযোগ। আমরাও প্রাসাদ ছেড়ে বাইরে বের হয়ে পড়লাম। বাইরের বাগানে ফলের অভাব নেই। খেয়ে ক্ষুধা দূর করলাম। এবার পালাবার চেষ্টা করতে হবে। আমরা কোথা দিয়ে পালান যায় ভাবতে থাকলাম। সমুদ্রের দিকে যেতেই কতকগুলি বাঁদর তাড়া করে এলো। আমরা ছুটে চলে এলাম। বুঝলাম, ওদিক পালান সম্ভব নয়। তবে? সেদিন উপায় বোঝা গেল না। তবে বুঝলাম, ভেতরে থাকলে দৈত্য একজনকে মারবে, কিন্তু বাইরে থাকলে সকলেই মরতে পারি।

সে রাতেও দৈত্য অমনি করে একজনকে মেরে ফেলে আধ সেদ্ধ করে খেল। তারপর ঘুমোল সেই পাটাতনের ওপর। আমরা

ভোরের অপেক্ষা করতে থাকলাম। ভোর হতে দৈত্য বেরিয়ে পড়ল। আমরা বাইরে এসে ফল খেলাম, পুকুর থেকে জল খেলাম। তারপর কয়েক দলে ভাগ হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লাম, অঞ্চলটা ভালো করে দেখে পালাবার পথ স্থির করবার জন্য।

আমি যে দিকটায় গিয়েছিলাম সেদিকে সামান্য গিয়েই পেলাম এক নদীর মোহনা। কিছু দূরেই সমুদ্র। এদিকে বাঁদরের উপদ্রব নেই। এদিক দিয়ে পালান যেতে পারে। কিন্তু কিভাবে? হঠাৎ একদিকে নজরে পড়ল এক গাদা কাটা কাঠ। সম্ভবতঃ জ্বালানি করবার জন্য গাছগুলো কেটে রেখেছে দৈত্যটিই। এ গাছগুলিকে জলে নামিয়ে বাঁধতে পারলে যে ভেলা হবে, তাতে করে পালান সম্ভব।

এই ভেবে উল্লাসে ফিরলাম। বন্ধুদের বল্লাম সব। স্থির হ'ল পরদিন এইভাবে ভেলা করে রওনা হব। সকলে সকলের দিকে তাকালাম। নিশ্চয় কাল যখন পালাব, তখন এর ভেতর একজন থাকবে না। সে একজন আমিও হতে পারি।

রাতে দৈত্য আসবে, আমাদের একজনকে খাবে এটা অভ্যাস হয়ে গেছে। সৌভাগ্যক্রমে আমাকে পছন্দ করল না দৈত্যটি। মনে মনে বল্লাম, এই তোমার শেষ গ্রহণ দৈত্য। কাল থেকে তোমার আর এত সহজে এত মনোরম খাদ্য মিলবে না।

পরদিন সকাল থেকে কাজে লেগে গেলাম। ঐ প্রাসাদে অনেক লোহার শিক ছিল। সেগুলি দিয়ে আমরা গাছগুলি বাঁধব বলে স্থির করলাম। কিন্তু গাছগুলো ঠেলে জলের কাছে নেওয়া সহজ নয়। সকলে পরিশ্রমেও অভ্যস্ত নন। ফলে যত সহজে কাজ শেষ হবে ভেবেছিলাম তা হ'ল না। সারাদিনে কোনক্রমে ভেলা তৈরী হ'ল। তাতে ফল এবং জলও তুললাম। কিন্তু জোয়ার না এলে ভেলা ভাসবে না। জোয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। জোয়ার আসবে গভীর রাতে।

অতএব লোহার শিক দিয়ে ভেলা তীরে এক গাছের সঙ্গে বেঁধে

রেখে আমরা আবার দৈত্যের বাড়িতে ফিরে গেলাম। যেতে যেতে বল্লাম, ভাই সব! আজ আবার একজনকে মরতে হবে। মরতে যখন হবেই তখন দৈত্যেরও সর্বনাশ করে আমরা এ স্থান ত্যাগ করব।

সকলে বল্ল, কিভাবে!

আমি বল্লাম, এই শিক দিয়ে। বলে দুটো হাত চারেক লম্বা টুকরো তুলে দেখালাম।

সবাই বল্ল, খুলে বল!

আমি বল্লাম, সবাইকে বলব না। আমি আর একজনকে ফন্দিটা বলে যাচ্ছি। দৈত্য আজ যদি আমাকে তুলে নেয় তবে সে সকলকে জানাবে।

এই বলে আমি একজনকে কানে কানে সব বলে দিলাম। সে আনন্দে চিৎকার করে উঠল। আমরা ধীর পায়ে দৈত্যের সেই মৃত্যু-গহ্বরে ঢুকলাম।

আজও দৈত্য এসে অনেককে পরীক্ষা করে একজনকে পছন্দ করল। তারপর একটানে তার মুণ্ডুটা ছিঁড়ে সবটা ফেলে দিল কড়াইতে। তারপর আধ সেদ্ধ হলে আগের মতই তৃপ্তি করে খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে আমি পা টিপে টিপে গিয়ে শিক দুটো ঢুকিয়ে দিলাম চুল্লিতে। খানিক পরেই শিক দুটো লাল হয়ে উঠল। এখনও আমি অপেক্ষা করতে থাকলাম। একজন দৌড়ে বাইরে গিয়ে দেখে এসে সংবাদ দিল যে জোয়ার এসে গেছে। আমাদের ভেলা পুরো জোয়ারে ভাসছে। বুঝলাম সময় হয়েছে।

এবার তুলে নিলাম শিক দুটো। আমার সঙ্গীকে দিলাম একটা, নিজে একটা। দু-জন দুটো নিয়ে একসঙ্গে ঢুকিয়ে দিলাম ঘুমন্ত দৈত্যের দুই চোখের মধ্যে। দৈত্য হাউ-মাউ শব্দে চিৎকার করে উঠল। আমরা আর কোনদিকে না তাকিয়ে প্রত্যেকে চুল্লির এক-একটা জ্বলন্ত কাঠ হাতে তুলে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম মোহনার উদ্দেশ্যে।

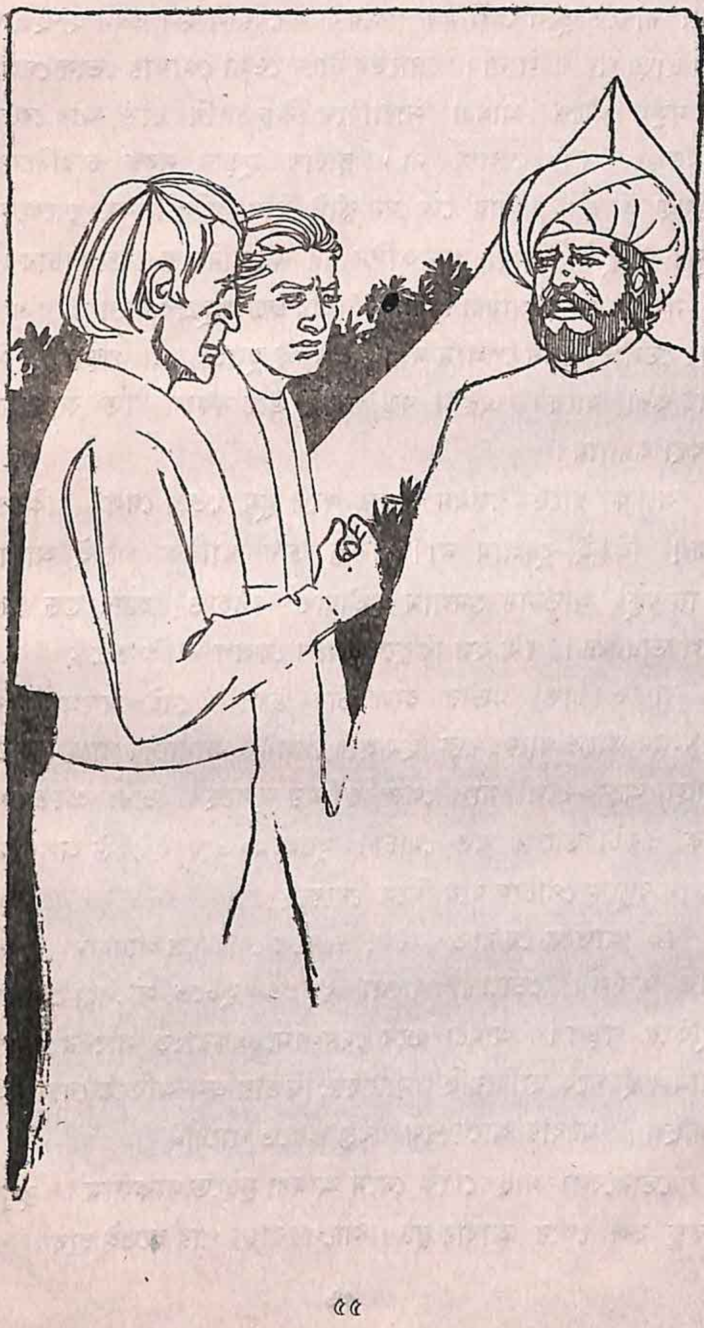
কি উল্লাসে যে সবাই গিয়ে ভেলায় উঠলাম তা বলে বোঝান যাবে না। এবার যদি জলে ডুবে মরি তাতেও ক্ষতি নেই। দৈত্যের হাতে ঐ বীভৎস মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচেছি, এটাই আনন্দের। সকলেই ভেলায় উঠে একে অন্যকে আলিঙ্গন করতে থাকল। আমি ভেলার বাঁধন খুলে বাইতে শুরু করলাম।

আমাদের ভেলা চলতে শুরু করতে না করতে আমাদের সেই জ্বলন্ত কাঠগুলির আলোয় দেখলাম আর একটি মেয়ে দৈত্য ঐ অন্ধ দৈত্যকে হাত ধরে টেনে আনছে সামুদ্রের দিকে। ওরা এসে দাঁড়াল একেবারে জলের ধারে। মেয়ে দৈত্যটি চিৎকার করে কি বল্ল। অন্ধ দৈত্য গর্জে উঠে দু-হাতে দমাদম নিজের বুকে কিল মারল। মেয়ে দৈত্যটি কোথা থেকে একটা মস্ত পাথর কুড়িয়ে এনে দিল অন্ধ দৈত্যের হাতে। সে দু-হাতে তুলে ছুঁড়ে দিল আমাদের ভেলার দিকে।

অন্ধের কি অবর্থ্য টিপ। সেই মস্ত পাথরটি এসে পড়ল ভেলায়। ঠিক মাঝে নয় এক পাশে পড়ল। তাতেই বিপর্যয় ঘটে গেল। সেই অন্ধকারে সব খুব ভাল করে দেখা না গেলেও বুঝলাম অন্ততঃ জনাদুয়েক সেই পাথরের ঘায়ে মারা গেছে। বহুজন ছিটকে পড়েছে জলে। তাদের ভেতর কয়েকজন আবার বহুকষ্টে ভেলায় উঠলো। কয়েকজন যে ক্রমেই দূরে ভেসে গেল—হারিয়ে গেল জলে তাও বুঝলাম। আমরা নিরুপায়। সেই অন্ধকারে কাউকেই সাহায্য করা গেল না। পাথরের আঘাতে ভেলার বাঁধন ছিঁড়ে যায় নি বলেই আমরা কজন রক্ষা পেলাম। দৈত্যটি আরও পাথর ছুঁড়ল। কিন্তু আমাদের ভেলা ততক্ষণে তাদের নাগালের বাইরে চলে গেছে।

দু-দিন দু-রাত আমাদের কেটে গেল ঐ ভেলাতেই। আমরা বেঁচে আছি আর মাত্র জনা দশেক। প্রাণে বেঁচেও কারো মনে কোন উল্লাস নেই। খাবার সময় খাই আর সারাদিন ভেলায় শুয়ে থাকি। শুধু পালা করে একজন দেখে কোন জাহাজের দেখা মেলে কি না!

কোন জাহাজের সন্ধান না মিললেও দু-দিন দু-রাত পর আমরা



আর এক অজানা দ্বীপে এসে পৌঁছালাম। আনন্দে নেমে পড়লাম সবাই। মুক্তির আনন্দে এত বিভোর হয়েছিলাম সবাই যে ভেলাটাকে বেঁধে রাখতে ভুলে গেলাম। পরে যখন খেয়াল হল তখন হা-হুতাশ করা ছাড়া পথ রইল না। স্রোতের টানে ভেলা কোথায় ভেসে গেল।

নতুন দ্বীপে আমরা সারাদিনে কিছু পাখি ছাড়া আর কোন জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। দুচোখ জুড়ান সবুজ চারদিকে। মস্তমস্ত গাছ। তলায় কে যেন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে রেখেছে। বন্ধুরা খুব খুশি। বল্লে, অনেকদিন পর আজ নির্ভয়ে রাত কাটাব।

সন্ধ্যার আগে আমরা রাত কাটাবার জন্য সমুদ্রের ধারে ফিরে এসে আর ভেলার সন্ধান পেলাম না। তখনই ভুলটা ধরা পড়ল। কি আর করা যাবে। একটা বড় গাছে উঠে সকলে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করলাম।

অনেক রাতে কেমন সরসর শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল। কিসের শব্দ! কিছুই বুঝলাম না। কিন্তু তার খানিক পরেই আমার কোন বন্ধুর আর্তনাদ শুনলাম। বাঁচাও—বাঁচাও! হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল তার স্বর। কি হল কিছুতে গিলে ফেলল নাকি তাকে?

আরও রাত গভীর হলে চাঁদ উঠল। সেই আলোতে যা দেখলাম তাতে গায়ের রক্ত হিম হয়ে গেল। আমাদের গাছের ডালে ডালে অনেকগুলো সাপ লেজ জড়িয়ে ঝুলছে। তারা প্রত্যেকেই এক একটা ডালের মত মোটা। বুঝলাম এদেরই কেউ আমাদের কোন বন্ধুকে পেঁচিয়ে ধরে গিলে খেয়েছে।

কি আতঙ্কে যে রাত কাটল, তা বলে বোঝাতে পারব না। তবু রাত কাটল। ভোরের আলো ফুটতে ফুটতে সাপেরা কোথায় লুকিয়ে পড়ল। আমরা গুনে দেখলাম, একরাতে সাপের কবলে আমরা দুজনকে হারিয়েছি। মনে হয়, দ্বিতীয় জন আতঙ্কে বোবা হয়ে গেছিল। মরবার আগে শব্দ পর্যন্ত করতে পারেনি।

ভোরবেলা গাছ থেকে নেমে আমরা ছুটতে থাকলাম। দুপুরে কিছু ফল খেয়ে আবার ছুট। সাপের রাজ্য পার হতেই হবে। সে



রাতও গাছে কাটালাম। সে রাতেও অমনি সাপের আক্রমণে আরও তিনজনকে হারালাম। কাউকে সাহায্য করবার কিছু নেই। অসহায় মৃত্যু। ভাগ্যি সাপে ধরেনি আমাকে।

অবশিষ্ট কজন ছুটতে থাকলাম পর দিনেও। আজ একটা পাহাড়ী এলাকায় এলাম। একটা গুহা মিলল। আমরা কোন-ক্রমে সকলে তার মধ্যে ঢুকে মুখ বন্ধ করে দিলাম পাথর দিয়ে। কে জানে, আজও আমরা সাপের রাজ্যে কি না!

হ্যাঁ। গভীর রাতে ঘুম ভাঙ্গল সাপের হিসহিসানিতে। কিন্তু সামনে পাথর দিয়ে গুহার মুখ আটকান। বুঝলাম এক কোণের সামান্য ফাঁক দিয়ে অনবরত মুখ ঢোকাতে চেষ্টা করছে একটা সাপ। কিন্তু ঐ টুকুতে তার মুখ ঢুকবে কেন। নাছোড়বান্দা সাপটা শেষে লেজ ঢুকিয়ে দিল সেই ফাঁকে তারপর টান দিতেই খুলে গেল পাথরটা। তখন সে সামনের একজনকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

পরদিন ভোরে উঠে দেখলাম, ভয়ে আতঙ্কে এক বন্ধু ওখানেই মরে আছে। আর এক বন্ধু পাগল হয়ে গেছে। আমরা সুস্থ আছি দুজন। একে অন্যের দিকে তাকালাম। কি কর্তব্য! পাগল বন্ধুকে ফেলেই কি চলে যাব! ঐ বন্ধুটি বল্ল, ওকে নিয়ে চল সঙ্গে। কে বলতে পারে! হয়ত কদিনেই ও সুস্থ হয়ে যাবে।

আমিও বল্লাম, সেই ভাল।

পাগল বন্ধু হঠাৎ চিৎকার করে উঠল, না। আমি যাব না তোমাদের সঙ্গে। যাব না। বলেই সে ছুটল পাহাড় বেয়ে। ধর ধর বলে আমার সেই বন্ধুও ছুটল তার পিছনে। খানিক দূরে গিয়ে জাপটে ধরল পাগলটিকে। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে। তারপর গড়াতে থাকল। সেই পাহাড়ি ঢালে কে আটকাবে তাদের! গড়াতে গড়াতে দুজনেই পাহাড়ি খাদে পড়ে গেল। আমি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম।

একা! একেবারেই একা। কিন্তু বাঁচতেই হবে আমাকে। কিন্তু কি ভাবে? গুহায় পাথর চাপা দিয়ে বাঁচা যাবে না। তবে?

প্রথমে খাওয়া এবং বিশ্রাম দরকার। দিনের বেলা আমি নিরাপদ। ফল খেলাম। একটা পরিষ্কার ডোবা থেকে জলও খেলাম। তারপর ঘাসের বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে নিলাম। এবার রাত্রের কথা ভাবতে হবে।

চলতে চলতে এক নদীর সন্ধান পেলাম। তার এক পাড়ে কিছু ভাঙ্গা তক্তা পড়ে ছিল। সম্ভবতঃ কোন নৌকার তক্তা। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি খেলে গেল। দৌড়ে গিয়ে বন থেকে অনেক লতা সংগ্রহ করে আনলাম। তারপর ঐ তক্তাগুলোকে মাপ মত বেছে বেছে পায়ে, হাতে, বুকে, পিঠে বাঁধতে থাকলাম। খানিকক্ষণের চেষ্টায় আমার চার দিকে কাঠের বর্ম তৈরী হয়ে গেল। আমি সেই অবস্থায় নদীর পাড় ধরে হেঁটে চল্লাম।

সন্ধ্যা হলে গাছে চড়ে বসলাম। গভীর রাতে আমাকেও সাপে আক্রমণ করল। কিন্তু আমার কাঠের বর্মের জন্য সে আমাকে মুখে পুরতে পারল না। তখন সে আমাকে লেজ দিয়ে পেঁচিয়ে চাপ দিতে থাকল। কিন্তু সে চাপ আমার গায়ে বসল না কাঠের ওপর দিয়ে যেতে থাকল। উল্টো দিকে কাঠের অসমান গায়ে ঘসা লেগে লেগে সাপটিই ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকল। অবশেষে এক সময় সে আমাকে ছেড়ে পালাল।

এই মহা অস্ত্র সম্বল করে আমি নদীর তীর বরাবর হাঁটতে থাকলাম। একদিন আবার সমুদ্রের কাছে এসে পড়লাম। ভাগ্য-ক্রমে একটা জাহাজের মাস্তুলও নজরে পড়ল। আমি আমার পাগড়ি নাড়তে থাকলাম। ওরা দেখতে পেল। আমাকে তুলে নিল। রক্ষা পাবার আনন্দে আমি জ্ঞান হারালাম।

ওদের শুশ্রূষায় আমি ক্রমে সুস্থ হলাম। ক্রমে ক্রমে হাঁটাচলা শুরু করলাম। এবার আমার জাহাজটাকে খুবই চেনা চেনা লাগতে লাগল। ইতঃমধ্যে জাহাজটি এসে নোঙ্গর করল সালহিতা দ্বীপে। সওদাগরেরা বাণিজ্য করতে গেল। আমি আর কি নিয়ে যাব। জাহাজেই থাকলাম।

একদিন কাপ্তেন বল্ল, সেখ। তুমি ত' সর্বস্ব খুইয়েছ। এক কাজ কর। আমার জাহাজে এক বণিকের মাল আছে। তাকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তুমি তার মাল বিক্রি কর। যা লাভ তা তুমি নিও যা আসল তা তুমি আমাকে দিও। আমি বাগদাদে সেই বণিকের আত্মীয়দের দিয়ে দেব।

আমি খুব খুশি হলাম। খোলের ভেতর সেই বণিকের মালের ওপর দেখলাম আমারই নাম লেখা। তখন আবার কাপ্তেনের দিকে চাইলাম। আমি তার নাম বল্লাম। সে চমকে উঠ্‌ল। তখন সে আমাকে খুব ভাল করে দেখে চিৎকার করে উঠ্‌ল—বণিক সিন্দবাদ! তাহলে আপনি জীবিত! এ তো আপনারই জাহাজ!

সে রাতে জাহাজে এক মস্ত ভোজসভা হ'ল। আমি সকলকে আমার দুটি অভিযানেরই গল্প বললাম। সকলে আমাকে স্পর্শ করে অভিনন্দন জানাল। অনেক উপহার দিল। আমরা খুবই আনন্দে আবার বাগদাদে ফিরে এলাম।

গল্প শেষ হতে অভ্যাগতেরা বল্লেন, আমরা এমন রোমাঞ্চকর কাহিনী আর শুনি নি। এমন পদে পদে বিপদ থেকে ফিরে আসা মানুষও কম।

সিন্দবাদ সেদিনও হিন্দবাদকে একশ মোহর দিলেন এবং পরদিন সকলকে পরের কাহিনী শুনতে আসবার নিমন্ত্রণ করলেন।



পরদিন গল্পের আসর জমতে কিছুমাত্র দেরী হ'ল না। নাস্তার শেষে সেদিন সকলে এসে বসলেন বাগানের পাশে এক বারান্দায়। অসংখ্য গোলাপের মিষ্টি গন্ধে ম ম করছে গোটা অঞ্চল। সুগন্ধি তামাকের নল অনেকের হাতে। সেই আলস্য মন্থর পরিবেশে সকলে সিন্দবাদকে পরের কাহিনী বলতে অনুরোধ করতে থাকল।

আমার চতুর্থ অভিযানের অভিজ্ঞতা এতক্ষণ যে সব কাহিনী বল্লাম তাদের থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এবারেও আমি উপস্থিত বুদ্ধি, ধৈর্য এবং সাহসের জোরেই প্রাণে বেঁচে প্রচুর ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরে এসেছিলাম।

গোড়া থেকে শুরু করি।

তৃতীয় অভিযান থেকে ফিরবার বছর খানেকের মধ্যেই আবার বাণিজ্য যাত্রার নেশা জেগে উঠল। আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু-বান্ধব সকলেই নিষেধ করতে থাকলেন। সত্যিই তখন আমার যা ঐশ্বর্য তাতে পায়ের ওপর পা দিয়ে বসে খেলেও কয়েক পুরুষে শেষ হবার নয়! তবে কেন আমার আবার বাণিজ্যে যাবার শখ?

আসলে সুখে নিশ্চিন্ত জীবন কাটান আমার রক্তে নেই। অজানা দেশ আমায় অবিরাম ডাকে। মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে জীবনকে তার থাবার ভেতর থেকে ছিনিয়ে আনতে আমার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে থাকে। আরাম বিলাস যেন আমার স্বস্তি কেড়ে নেয়, কাঁটা হয়ে বিঁধতে থাকে। তাই আবার বাণিজ্য যাত্রার আয়োজন করলাম।

ইতঃমধ্যে আমার জাহাজের কাপ্তেনের মৃত্যু হয়েছে। এই সব কলকব্জা চালাবার উপযুক্ত কাপ্তেনের সন্ধান পেলাম না। ফলে আমার জাহাজ বাঁধা রইল। আমি ভাড়াটে জাহাজে চড়ে রওনা হলাম।

গুটি পাঁচেক বন্দরে কাজ করবার পর বিপদে পড়ল জাহাজ। সেদিন সকালে আকাশের এক কোণে এক টুকরো কালো মেঘ দেখে

কাপ্তেন এসে বল্ল, সর্বনাশ, ঐ মেঘ টুকরো ভাল নয়। এখুনি ভীষণ ঝড় শুরু হবে!

কাপ্তেনের আদেশে তখুনি পালগুলো গুটিয়ে ফেলা হ'ল। ওপর থেকে সব কিছু টেনে নামান হ'ল নিচে। দেখতে দেখতে সেই এক টুকরো কালো মেঘ বড় হতে হতে ছেয়ে ফেলল সারা আকাশ, হু হু করে প্রচণ্ড বাতাস ছুটে এলো। এক একটা ঢেউ দোতলা-তিন তলা পর্যন্ত উঁচু হয়ে উঠল। ছড়িয়ে পড়ল এক মাইল-দুমাইল। আমাদের জাহাজটাকে যেন বলের মত লোফালুফি করতে থাকল সেই ঝড়। আমরা সকলেই সমুদ্রে অভ্যস্ত হলেও এমন অসম্ভব খেপামিতে অভ্যস্ত ছিলাম না। কেউ কেউ বমি করতে করতে নেতিয়ে পড়ল। আমি আমার বিছানায় শুয়ে রইলাম।

হঠাৎ এক ঝাঁকুনিতে ছিটকে পড়লাম আমি। বুঝি আতঙ্কে চোখ বুঁজে ছিলাম। চোখ খুলতেই দেখলাম আমি আর জাহাজের খোলে নেই। ওপরে মুক্ত আকাশ। ঠিক তার পরেই ঝপ্ করে জলে পড়লাম। বুঝলাম ঝড়ের আঘাতে ঢেউ-এর ধাক্কায় আমাদের জাহাজ ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেছে। জলের মধ্যে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ এক টুকরো কাঠ পেলাম। সেটা সম্বল করে ভাসতে থাকলাম। সৌভাগ্যক্রমে এক সময় ঢেউ আমাকে এক বালুতটে এনে আছড়ে ফেল্ল। আমি কোনক্রমে হামাগুড়ি দিয়ে একটু ওপরে উঠে বালুর ওপরেই শুয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গলে দেখলাম আমার মত আরও কয়েকজন সহযাত্রী রক্ষা পেয়েছে। আমরা সকলে একত্র হয়ে আহার এবং আশ্রয়ের জন্য বেলাভূমি ছেড়ে ভিতরে প্রবেশ করলাম।

একটু এগুতেই একটা গ্রাম নজরে পড়ল। সেখানে কলো কালো স্বাস্থ্যবান ছেলেমেয়েরা খেলা করছে। মেয়েরা কাজ করছে। কিন্তু সবাই উলঙ্গ। সকলেই আমাদের দেখে কাজ কর্ম রেখে বিস্ময়ে দেখতে থাকল। হঠাৎ একটি পুরুষ এগিয়ে এসে আমাদের কি সব ইঙ্গিত করল। সে আমাদের আক্রমণ করল না দেখে আমরা তার

পিছু পিছু চল্লাম। কিছু দূর গিয়ে আমরা একটা মস্ত সাদা বাড়ি দেখতে পেলাম। ঐ লোকটিও আমাদের ঐ বাড়ির দিকে নিয়ে চল্ল।

আমরা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলাম যে, ঐ বাড়িটা নিশ্চয় ওদের রাজার। কেন না অমন বাড়ি আর ছিল না। কেউ বল্ল ভালই হ'ল। আমরা প্রথমেই রাজ-দরবারে হাজির হচ্ছি।

বাড়িটার কাছাকাছি আসতেই আরও একদল উলঙ্গ লোক আমাদের ঘিরে ফেল্ল। কিন্তু তারা কোন কথাই বল্ল না। সকলে মিলে এগিয়ে চল্লাম বাড়িটার দিকে।

ভিতরে ঢুকে আমরা সামনে একটা উঁচু আসনে একজনকে বসে থাকতে দেখলাম। তার মাথায় মুকুট। গায়ে অলঙ্কার। বুঝলাম তিনিই রাজা। আমরা নত হয়ে তাঁকে সম্মান দেখালাম। রাজা কি ইঙ্গিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক ছুটে গিয়ে একটা তামার থালায় কিসের মাংস নিয়ে এলো।

তখন আমরা ভীষণ ক্ষুধার্ত। আমার বন্ধুরা কাড়াকাড়ি করে সেই মাংস খেতে থাকল। কিন্তু সব মিলিয়ে আমার যেন কেমন অস্বস্তি হতে থাকল। ঠিক না বুঝলেও আমার মনে হতে থাকল যেন কোন বিপদ ঘনিয়ে আসছে। আমি সে মাংস খেলাম না।

আমার বন্ধুরা ঐ মাংস খেয়ে ঢেঁকুর তুলতে থাকল। তখন রাজার আদেশে আমাদের নিয়ে গিয়ে গদিয়াল বিছানায় শুতে দেওয়া হ'ল। ওরা ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু আমার ঘুম এলো না। আমি চোখ বুঁজে ঘুমাবার ভান করলাম।

এক সময় দেখলাম, ঘরে আর কোন প্রহরী নেই। তখন উঠে আমি জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম। তাকিয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার অন্তরাত্মা খাঁচা ছাড়া হবার জোগাড়। দেখলাম, একদল উলঙ্গ মানুষ কাঁচা মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। আর একদল একটা আধপোড়া মানুষ-দেহ বয়ে নিয়ে এলো। তার থেকে কেটে কেটে থালায় সাজাতে লাগল। তারপর সেই থালা নিয়ে গেল রাজসভায়।

এই দৃশ্য দেখে আমি সব বুঝতে পারলাম। অনেক নাবিকের মুখে শোনা নর-খাদক হাবসিদের রাজ্যে এসে পড়েছি আমরা। হাবসিরা কাঁচা নরমাংস খেতেই ভালবাসে। কিন্তু এদের রাজার খাবার পদ্ধতি আলাদা। তিনি মানুষ পেলেই খান না। তাকে খাইয়ে দাইয়ে মোটাসোটা করে তারপর তাকে খাদ্যে পরিণত করেন। কি ভাবে? আগে তাকে ভাল করে স্নান করান হয়। তারপর তার গায়ে আচ্ছা করে তেল মশলা ডলতে থাকে। তেল মশলার জ্বলুনি শুরু হয়। লোকটা পরিত্রাহি চিৎকার করতে থাকে। লোকটা যত চিৎকার করে ওরা বোঝে ততই মশলায় সরেশ হচ্ছে মাংস। অশেষ যন্ত্রণায় লোকটি শেষ পর্যন্ত নেতিয়ে পড়ে। তখন ওরা তাকে একটি শিকে গিঁথে আগুনে ঝলসাতে থাকে। ঠিকমত ঝলসান হ'লে তার থেকে কেটে কেটে রাজাকে খেতে দেয়।

আমি বুঝলাম, যে হতভাগ্যর আধ-ঝলসান দেহ ওরা বয়ে নিয়ে গেল, সেও অমন যন্ত্রণা পেয়ে মরেছে। আমাদের ভাগ্যেও অমন মৃত্যু অপেক্ষা করছে।

কিন্তু এমনভাবে মরতে আমি রাজি নই। বন্ধুরা উঠলে তাদের সব কথা খুলে বল্লাম। ওরা হো হো করে হাসল। বল্ল, এ সব তোমার উদ্ভট কল্পনা। অমন সুস্বাদু মাংস আমরা জীবনে খাইনি। ও যে মুর্গি-মসল্লমের চেয়েও ভাল। ও কি নরমাংস হতে পারে!

ওরা আমাকে উপহাস করল। আমি চুপ করে রইলাম।

এরপর রোজ ওরা আমাদের গাড়ি করে নানা জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যেতে থাকল। নানা রকম ফল দুধ-ছানা-মাখন এনে দিতে থাকল সামনে। বুনো ফুল থেকে তৈরী মদও দিতে থাকল। বন্ধুরা আনন্দে স্ফূর্তিতে মেতে উঠল। নিত্য রাজার গুণগান করতে থাকল। কিন্তু আমি নেহাৎ প্রাণরক্ষার জন্য এক আধটা ফল আর শুধু জল খেয়ে দিন কাটাতে থাকলাম।

একে দুশ্চিন্তা তায় উপবাস—দিনকে দিন আমার শরীর কৃশ হতে থাকল। শক্তিও কমে এলো। এখন ভাল করে হাঁটতে চলতে

পারি না। অনবরত মাথা ঘোরে। আমাকে আর ওরা বেড়াতে যাবার জন্য ডাকে না। রোগা মানুষের দিকে নজরও রাখে না। আমি মাঝে মাঝে একা একাই ঘরের বাইরে যাই। খানিক গিয়ে শুয়ে পড়ি। আবার উঠে আসি। ওরা ভাবে এ ঘাটের মড়া মরলেই বাঁচি।

বুঝলাম সুযোগ এসেছে। পর পর দুদিন ঠিকমত খেয়ে শরীরে শক্তি সঞ্চয় করে নিলাম। কিন্তু ঢং করে পড়ে রইলাম বিছানায়। তারপর রাত হতে না হতে সকলের অলক্ষ্যে বেরিয়ে পড়লাম।

আমার লক্ষ্য সমুদ্র। সারারাত ছুটলাম। ভোর বেলা গাছের ফল সংগ্রহ করে খেয়ে একটু বিশ্রাম করে আবার ছুটতে থাকলাম। কিন্তু কোথায় সমুদ্র! সমুদ্র না পাওয়া পর্যন্ত থামব না। শুধু ভয় আবার হাবসিদের হাতে না পড়ি।

কপাল ভাল। ক্রমাগত আটদিন ছুটে এক মাঠের মধ্যে এসে পড়লাম। চষা মাঠ। মাঠের চারদিকে বেড়া দেওয়া। একদল লোক মাঠে মাঠে কাজ করছে। তাদের পরনে কাপড়। মাথায় টুপি।

তাহলে সভ্য মানুষের এলাকায় এসেছি।

আমি আনন্দে চিৎকার করে উঠলাম। ওরা সবাই কাজ ফেলে এসে জমল আমার চারপাশে। এ কি! এরা যে আমারই ভাষায় কথা বলে! ওরা জিজ্ঞাসা করল, কোথা থেকে এলে তুমি! এ দশা কেন তোমার।

অনেক থেমে আমার গল্প বল্লাম। সব শুনে ওরা বল্ল, আহা, আহা! কতদিন তোমার খাওয়া হয় নি!

আমি দুঃখেও হাসলাম। বল্লাম, খাই নি তাই বেঁচেছি। এবার তোমাদের কাছে খাব।-

ওরা আহা আহা করে নিয়ে গেল ওদের ঘরে। আমাকে আদর যত্ন করে খেতে দিল। দিন দুই সারা গ্রাম মেতে রইল আমাকে নিয়ে। আমিও বড় আনন্দে কাটালাম দিন কটা। আনন্দে আর বিশ্রামে আমি আবার বল ফিরে পেলাম। এবার ওরা আমাকে নৌকা করে নদী পেরিয়ে নিয়ে চল্ল শহরে ওদের সুলতানের দরবারে।

নদীর পাড় থেকেই জমে উঠেছে শহরটা। জমজমাট হাট বাজার। চওড়া রাস্তা। লোকজন দেখলাম বাহারী রং চং দেওয়া পোশাক পরতে ভালবাসে। একটু ধনী লোকেরা বেশ তাগড়াই ঘোড়া, উট, খচ্চর চড়ে যাতায়াত করছে। একটা মজা দেখলাম, কোন জন্তুর মুখেই লাগাম নেই। ওরা জন্তুটির ঘাড়ের চুল বা কান খামচে ধরে রয়েছে। আশ্চর্য! এত সভ্য শহর! কিন্তু লাগামের ব্যবহার জানে না!

আমার কোমরের গেঁজেতে কয়েকটা মণি লুকোন ছিল। সুলতানের দরবারে প্রবেশ করার আগে তার থেকে মাত্র দু'টি আমি বের করে নিলাম। দরবারে গিয়ে কুর্নিশ করে দাঁড়ালাম। আমার সঙ্গীরাই আমার পরিচয় দিল।

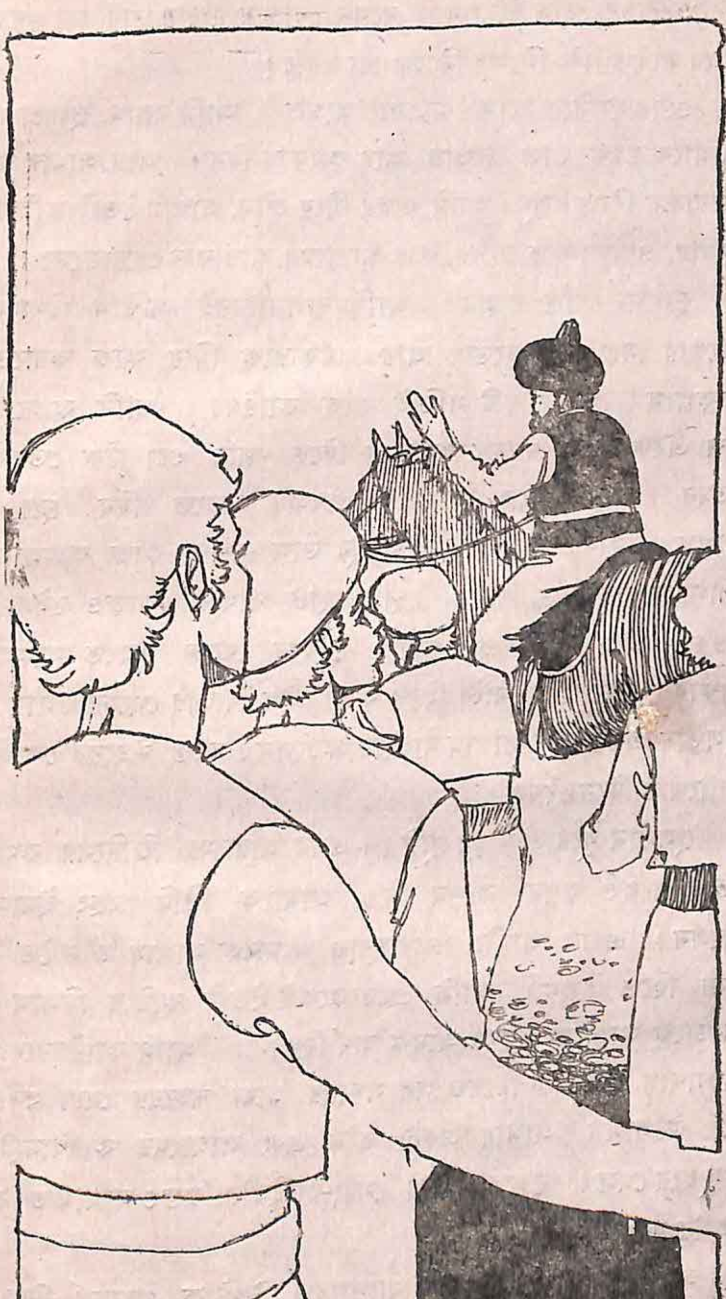
আমি মাথা নত করে আবার কুর্নিশ করলাম। সুলতানের সামনে মণি দুটি এগিয়ে দিয়ে বল্লাম, সুলতান, এই গরীব আদমির কাছে আর কিছু নেই। তাই এই সামান্য নজরানা রাখলাম।

জানতাম মণি দুটি দুষ্প্রাপ্য। ঐ মণি দেখে সুলতানের চোখ বড় হয়ে উঠল। তিনি নিজে হাতে ঐ মণি নিয়ে আমাকে ওমরাহদের পাশে বসতে বল্লেন। আমার সঙ্গীরা আমার এই সমাদরে আনন্দিত হয়ে ফিরে গেল।

এবার আমি সুলতানের দিকে ফিরে বল্লাম, সুলতান, আমি বাণিজ্য করতে বহুদেশে ঘুরেছি, বহু শহর দেখেছি কিন্তু আপনার এ শহর আমাকে মুগ্ধ করেছে। এ শহর যেমন সুন্দর তেমনি শান্তির।

আমার এ কথায় সকলে সুলতানের জয়ধ্বনি করে উঠল। আমি বল্লাম, কিন্তু সুলতান! আপনার এখানে সবাই ঘোড়ায় গাধায় ওঠে তার চুলের মুঠি ধরে। লাগাম ব্যবহার করে না কেন? জীন থাকে না কেন?

সুলতান বল্লেন, সে আবার কি জিনিস! সে সব জিনিসের নামও শুনি নি তো কখনও।



ওমরাহরা হেসে উঠলেন। বল্লেন, ঘোড়ায় গাধায় তার চুল ধরে উঠবে না তো কি নিজের নিজের চুল ধরবে!

ওদের হাসিতে আমার মর্যাদায় লাগল। আমি বল্লাম, সুলতান, আমাকে দুজন ভাল ছুতোর আর কর্মকার দিন। আর আমার যা প্রয়োজন দিতে বলুন। আমি ওদের দিয়ে জীন, লাগাম তৈরী করিয়ে দেখাব, ওগুলো কত সুখের, কত আরামের আর কত প্রয়োজনের।

সুলতান রাজি হলেন। আমি সুলতানেরই অতিথি হিসাবে রাজ্যের সেরা দুই ছুতোর আর কর্মকারকে দিয়ে কাজ করাতে থাকলাম। লোক দুটি সত্যিই ভাল কারিগর। আমি কাগজে নক্সা এঁকে ওদের যেমন যেমন করে দিতে বল্লাম ওরা ঠিক তেমন তেমন করে দিতে লাগল। প্রথমটি করতে দিন দুয়েক লাগল। জীনটিতে মুচিকে দিয়ে খুব ভাল নক্সার কাজ করালাম সোনা রূপোর সুতো দিয়ে। ছোট ছোট পাথরের কাজও রইল। ভেতরে রইল আরামপ্রদ গদি। সেখান থেকে ঝুলতে থাকল রেকাব। কাপড়ের মোটা ফিতে বাঁধা রইল ঘোড়ার পেটের তলায়। সুলতান প্রথম জীন লাগাম ব্যবহার করলেন। সমস্ত শহরের লোক দুপাশে দাঁড়িয়ে দেখল।

সুলতান ঘুরে এসে খুব খুশি। এমন আরামের জিনিসের কথা তিনি স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি। আমাকে তিনি বহুৎ ইনাম দিলেন। এবার আমীর ওমরাহরাও আমাকে লাগাম জীন তৈরী করে দিতে বল্লেন। আমি প্রত্যেককেই তৈরী করিয়ে দিলাম। প্রত্যেকে আমাকে অনেক অনেক অর্থ দিলেন। আমি কারিগরদের প্রত্যাশার অতিরিক্ত দিয়েও অল্প সময়ের মধ্যে শহরের সেরা ধনী হয়ে উঠলাম। আমার একটা জীন এবং লাগামের কারখানাই চালু হয়ে গেল। সুলতান তাঁর সেনা-বাহিনীর জন্যও লাগাম জীন তৈরীর বরাত দিলেন।

আমি সুলতানকে শাসন ব্যাপারেও টুকটাক পরামর্শ দিতে থাকলাম। আমার পরামর্শে সুফল পেয়ে সুলতান আমাকে

প্রাসাদে নিয়ে এলেন। আমি দিনরাত তাঁর সহচর হলাম। সুলতান আমাকে ছাড়া এক পাও নড়েন না। এমন কি বেগমরাও আমার সঙ্গে সহজ ব্যবহার করা শুরু করলেন।

একদিন বিকেলে আমি, বেগম সাহেবা আর সুলতান তিনজনে বসে ছিলাম গুল বাগিচায়। হঠাৎ বেগম বল্লেন, সিন্দবাদ, তুমি তো জান, তোমাকে আমরা কত ভালবাসি।

আমি মাথা নত করে বল্লাম, আপনাদের মেহেরবাণী। আমার মত সামান্য মানুষের প্রতি আপনাদের ভালবাসার তুলনা হয় না।

সুলতান বল্লেন, তোমাকে আমরা আরও একটু বেশি বাঁধনে বাঁধতে চাই।

আমি বল্লাম, আদেশ করুন সুলতান।

সুলতান বল্লেন, শাহী বংশের এক সুন্দরী শিক্ষিতা কন্যা বিবাহযোগ্যা। আমার পুত্র থাকলে আমি তার সঙ্গে বিয়ে দিতাম। আমার ইচ্ছা, তুমি তাকে বিয়ে কর।

আমি একজন সাধারণ বণিক। আমার সঙ্গে শাহীবংশের কন্যার বিয়ের প্রস্তাব যে সুলতান কতখানি ভালবাসা থেকে করেছেন, তা চিন্তা করে আমার চোখে জল এলো। আমি বল্লাম, আপনার ইচ্ছাই আমার কাছে আদেশ। আমি আপনার স্নেহের দাস।

তাহলে শাদীর আয়োজন করি!

আমি মাথা নত করলাম।

সুলতান আমার বিয়েতে এত জাঁক-জমকের আয়োজন করলেন, যেন সত্যিই শাহজাদার বিয়ে হচ্ছে। রাজ্যের সবাই এ বিয়েতে খুশি হলেন। এমন কি আমার সেই গ্রামের বন্ধুরাও এসে আমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল। আমার জীবনে খুশির বন্যা বয়ে গেল। সুলতান আমার জন্য পৃথক প্রাসাদের ব্যবস্থা করে দিলেন।

এর মধ্যেই একদিন আমার পাশের বাড়ির এক ওমরাহের বিবি মারা গেল। ওমরাহের সে কি কান্না। আমি কিছুতেই তাকে সান্ত্বনা দিতে পারলাম না। বন্ধু ওমরাহ কেঁদেই চল্ল।

আমি আবার বল্লাম, দোস্ত! বিবির মৃত্যু খুবই দুঃখের। কিন্তু তার জন্য এত কান্না কেন? তোমার এই জোয়ান বয়স। তোমাকে আবার সুন্দরী মেয়ের সঙ্গে শাদী দেওয়া হবে।

বন্ধু ঐ দুঃখের মধ্যেও হেসে ফেল্ল। বল্ল, তুমি আমায় হাসালে দোস্ত। আর এক ঘণ্টার মধ্যেই আমাকে এই মৃত বিবির সঙ্গে কবর দেওয়া হবে। আমার আবার বিয়ে!

তার কথা শুনে চমকে উঠলাম! এ কি সাংঘাতিক কথা! জ্যান্ত লোককে কবর দেওয়া! আমি বল্লাম, সে কি!

পাশের লোকেরা বল্ল, তুমি কি আমাদের দেশের রীতি জান না! এ দেশে স্বামী বা স্ত্রী যেই আগে মরুক, অন্য জনকে তার সঙ্গে কবরে পাঠান হয়।

যদি স্বয়ং বেগম সাহেবা মারা যান!

তাহলে সুলতানকেও সহমরণে যেতে হবে!

আমি বিদেশী। আমার জন্য নিশ্চয় এ নিয়ম নয়!

সকলে হেসে উঠল। বল্ল, যে ব্যক্তিই এ দেশে বাস করে সেই এ নিয়ম মানতে বাধ্য।

ওদের কথা শুনে ভেতরে ভেতরে আমি শুকিয়ে গেলাম। এ সব নিয়ম জানলে কে বিয়ে করত এদেশে! কি সর্বনাশ দেশ রে বাবা! এবারে বুঝলাম বিবি-মরা ওমরাহের এত কান্না কেন! কান্না বিবির জন্য নয়—নিজের জন্য। লোকটির কথা ভেবে আমার কান্না পেতে থাকল। আমি কাঁদতে কাঁদতে তার পিঠে হাত বোলাতে থাকলাম।

সত্যিই ঘণ্টা খানেকের মধ্যে শবযাত্রার আয়োজন সমাপ্ত হ'ল। পড়শীরা মিছিল করে শব বহন করে চল্ল। একদল ঘিরে নিয়ে চল্ল বিবির স্বামীকে। শহর ছাড়িয়ে অদূরে যে পাহাড়, সেখানে এসে

মিছিল শেষ হ'ল। তখন সবাই মিলে একটা মস্ত পাথর ঠেলে সরাল। তলা থেকে বেরিয়ে পড়ল মস্ত এক গহ্বর। দড়ি বেঁধে তার মধ্যে নামিয়ে দেওয়া হ'ল শবদেহ। তারপর ঐ ব্যক্তির হাত বেঁধে দড়ি দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হ'ল নিচে। সঙ্গে দেওয়া হ'ল সাতখানা রুটি আর এক কলসি জল। এতে যে কদিন বাঁচতে পারে বাঁচবে, তারপর আপনা থেকেই মারা যাবে। ওপরের গহ্বর মুখ আবার বন্ধ করে দেওয়া হল।

সকলের সঙ্গে ধীর পদে বাড়ি ফিরে এলাম বটে, কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। আমি ছুটে গেলাম সুলতানের কাছে। বল্লাম, এ আপনি আমার কি সর্বনাশ করলেন! আমার বিবি যদি আগে মারা যায়—

সুলতান বল্লেন, কেন? তার কি কোন—

না, না। তার কোন রোগ নেই। মৃত্যুর লক্ষণও নেই। তবু, যদি সে আগে মরে তবে আমাকে মরতে হবে কেন? বিশেষতঃ আমি বিদেশী।

সুলতান হাসলেন। বললেন, যে নিয়ম আমি মানছি আমার বাপ-ঠাকুরদা মেনেছেন, তাতে এত আতঙ্ক বোধ করছ কেন?

সুলতানের কথাতেও আশ্বাস পেলাম না। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলাম। মনে হতে থাকল যে বাড়ি গিয়েই বিবিকে মৃত দেখব। পথে প্রায় ছুটতে ছুটতে এলাম। না। তিনি মারা যান নি। হেসেই আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, কি! ভেবেছিলে বুঝি আমি মরেই গেছি।

তখনকার মত নিশ্চিন্ত হলেও আমার আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। দিনের মধ্যে শতবার এসে দেখে যেতে থাকলাম যে আমার স্ত্রী সুস্থ আছেন কি না। বিবির আদর-যত্ন বাড়িয়ে দিলাম। সকলে আমার এই আচরণ নিয়ে ঠাট্টা করতে থাকল।

কিন্তু এমনই আমার বদ-নসিব যে ভাল মানুষ বিবি আমার হঠাৎ একদিন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন—আর উঠলেন না। আমি হায়

হায় করে উঠ্‌লাম। প্রথম শোক একটু কমতেই পালাবার কথা ভাবলাম। কিন্তু সাধ্য কি পালাই! সংবাদ পেয়ে আমীর ওমরাহ সবাই এসে হাজির হয়েছেন আমার বাড়িতে। একটু পরে স্বয়ং সুলতানও এসে হাজির হলেন। সবাই আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে শব-যাত্রার আয়োজন করতে থাকলেন। আমি ডুকরে কেঁদে উঠে সুলতানকে বল্লাম, আমায় ছেড়ে দিন। আমি বিদেশী। আমাকে এভাবে মারবেন না।

কেউ আমার কথায় কর্ণপাত করলেন না।

আমার মৃতা বিবিকে প্রায় শাদীর সাজে সাজান হ'ল। সবাই তাঁকে নানা উপহার দিল। শাদীতে সে যা পেয়েছিল এখন তার থেকে কম পেল না। সবাই কাঁদতে কাঁদতে চল্ল তার সঙ্গে। আমাকেও টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চল্ল। স্বয়ং সুলতানও চল্লেন সেই শবযাত্রীর।

নরখাদকদের হাত থেকে বেঁচেছিলাম। কিন্তু এদের হাত থেকে রক্ষা নেই। ওরা সেই পাহাড়ে পৌঁছে বিবির দেহ নামিয়ে দিল। আমি আবার কেঁদে পড়লাম সকলের পায়ে। কিন্তু কেউ আমাকে এতটুকু দয়া দেখাল না। যে সুলতান আমাকে এত ভালবাসতেন, যে বেগম সাহেবা নিত্য আমার জন্য নানা রকম খাদ্যদ্রব্য পাঠাতেন—তাঁরাও আমাকে ধিক্কার দিতে থাকলেন। আমার ভালবাসার অভাবেই নাকি আমার বিবি মারা গেছেন। তেমন টান থাকলে নাকি আমি এমন পাগলের মত কাণ্ড করতাম না।

ওরা যাই বলুক, আমি কিছুতেই গহ্বরে নামতে চাইলাম না। যত রকমে সম্ভব বাধা দিতে থাকলাম। কিন্তু অত লোকের সঙ্গে একার কি লড়া সম্ভব। ওরা আমাকে বেঁধে ছেদে নিচে নামিয়ে দিল। আমি দড়িটা চেপে ধরে রইলাম। ওরা যতই ছাড় ছাড় করতে থাকল, আমি তত জোরে ধরে থাকলাম। শেষ পর্যন্ত ওরা দড়িটাও নামিয়ে দিয়ে গহ্বর বন্ধ করে দিয়ে চলে গেল। আমি

অন্ধকার কবরখানায় আমার মৃতা বিবি আর শত কঙ্কালের মধ্যে বসে রইলাম।

দুঃখে রাগে ক্ষোভে আমি ছটফট করতে থাকলাম। হাতের বাঁধন ফাঁস দিয়েই বাঁধা ছিল। টান দিতেই খুলে গেল। বিবিকে দুহাতে ঝাঁকুনি দিয়ে বল্লাম, রাক্ষসি! এমনি করে আমার সর্বনাশ করলি!

ক্রমে উত্তেজনা কমে এলো। অন্ধকারও গা সওয়া হয়ে এলো। এখানকার গুমট দুর্গন্ধ ততক্ষণে সহ্য হয়ে এসেছে। হাতড়ে সঙ্গের রুটি সাতখানা কোলে নিলাম। কি খেয়াল হল, খাট থেকে বিবির দেহটা দূরে ফেলে দিলাম। একটা গহনার বাক্সে গহনা ফেলে রুটি কটা রাখলাম। জলের কলসিটা গুছিয়ে রাখলাম। দড়িটাও গুটিয়ে রাখলাম। যেন আমার গৃহস্থালী গোছাচ্ছি। এক সময় ক্লান্ত হয়ে ঐ খাটেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

ওখানকার অন্ধকার আমার চোখে আরও সয়ে এলো। আমি তখন সব দেখতে পাচ্ছি। সারা দিনে কাজ নেই। তাই চারদিকে ঘুরে ঘুরে সোনা-দানা অলঙ্কার সংগ্রহ করতে থাকলাম আর খুঁজতে থাকলাম কোন পথে এখান থেকে বের হওয়া যায় কিনা!

কৃপণের মত রুটি জল খেতে থাকলাম। ক্রমে অনেকগুলি কলসিতে একটু একটু জল অবশিষ্ট আছে দেখলাম। সে সব জল এক করে রাখলাম। কয়েক দিনের মধ্যে সব রুটি শেষ হয়ে গেল। এবার শুধু জল। শুধু জল খেয়ে ক'দিন বাঁচা যায়! হে আল্লা! তবে কি আমাকে না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে!

আল্লার অসীম দয়া। ইতঃমধ্যে শহরে কেউ মারা গেল। ওপরের মুখ খুলে প্রথমে শব নামিয়ে দেওয়া হল। তারপর নামান হল হতভাগ্য স্বামীটিকে। প্রথমে ভাবলাম সঙ্গী হল। কিন্তু পরমুহূর্তেই সাতখানা রুটির কথা মনে হতেই আমি পিশাচের মত ঝাঁপিয়ে পড়লাম লোকটার ওপর। দুহাতে ওর গলা টিপে ধরলাম। ভয়েই হোক আর আতঙ্কেই হোক অথবা আমার গলা টিপুনিতেই

হোক, লোকটা এলিয়ে পড়ল। আমি তাকে টেনে নিয়ে দূরে ফেলে দিলাম। তার সাতখানা রুটি আর জল আমার সঞ্চয় হ'ল।

এমনি করে নরহত্যা আমাকে কত করতে হ'ত তা কে জানে! কিন্তু তার আগেই একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল।

সেখানে দিনরাত বোঝা মুস্কিল। তাই ঘুম পেলেই ঘুমাতাম। সে দিনও তখন ঘুমিয়েছিলাম। মনে হল কি যেন একটা জীব আমার মুখ শুঁকল। স্পষ্ট তার স্পর্শ পেলাম। আমি কিন্তু আতঙ্কে লাফিয়ে উঠলাম না। চোখ মেলে বুঝতে চাইলাম কিসে আমাকে স্পর্শ করল।

দেখলাম একটা চার-পেয়ে জীব!

আশ্চর্য! এটি এলো কোথা থেকে? এ তো এতদিন ভেতরে ছিল না। তা হ'লে দেখতে পেতাম। নিশ্চয় নতুন ঢুকেছে। সঙ্গে সঙ্গে মাথায় বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। তা হ'লে নিশ্চয় এখানে ঢোকা বেরুবার পথ আছে। আমি জীবটিকে তাড়া করলাম।

এবার মনে হল শেয়াল জাতীয় জীব। সে যে রাস্তায় ছুটল, আমিও সে রাস্তায় ছুটলাম। অন্ধকারে তখন আমি পশুর মতই দেখতে পাই। বুঝলাম গহ্বরটার থেকে একটা শুড়ি পথ এঁকে বেঁকে বহুদূরে গেছে। সেই জন্য কোন আলো দেখা যায় না। অথচ বাতাস এসে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। খানিক ছুটতে ছুটতে দূরে আলোর রেখা দেখতে পেলাম। অবশেষে এসে দাঁড়ালাম আকাশের তলায়। আঃ মুক্তি! তা হলে সহমরণের দেশ থেকেও বেঁচে ফিরলাম! আল্লার অসীম করুণা। আমি হাউ হাউ করে কেঁদে আল্লার কাছে কৃতজ্ঞতা পেশ করলাম।

এবার ভাল করে চারদিক দেখলাম। বুঝলাম খাড়াই পাহাড়টার ওপারে শহর। এপারে লোক আসে না। তাই জানে না মৃত্যু-গুহা থেকে বের হবার পথ। পাহাড়ের পাদদেশেই সমুদ্র। অতএব একদিন না একদিন আমার মুক্তিদূত হিসাবে কোন জাহাজ আসবেই।

আমি আবার মৃত্যু গুহায় ঢুকে গেলাম। এবার আমার বিছানার চাদরে আমার কুড়োন সব গহনা মণিমুক্তা বাঁধলাম। জলের কলসি আর রুটি কটা নিয়ে বাইরের পথে রওনা হলাম। গুহা মুখটাকে আমি আমার বসবাসের জায়গা করলাম। দিনে চোখ মেলে চেয়ে থাকতাম সমুদ্রের দিকে। রাত্রে গুহামুখে ডালপালা জড়ো করে আগুন জ্বেলে দিতাম পাথরে পাথরে ঠুকে। ফলে কোন হিংস্র জীব-জন্তুর আক্রমণের আর সম্ভাবনা রইল না।

এক এক দিন চলে যেতাম গুহার মধ্যে। কত বছর ধরে এখানে কবর দেওয়া হচ্ছে কে জানে। যাদের কবর দেওয়া হয়েছে তাদের অর্ধেক নারী। অতএব খুঁজলেই নানা অলঙ্কার পাওয়া যায়। সে অলঙ্কার সংগ্রহের নেশা পেয়ে বসল আমাকে। দিনের মধ্যে পালা করে অলঙ্কার সংগ্রহ শুরু করলাম। বিশ পঁচিশ গাঁট গহনা জমে গেল।

এমন সময় একদিন ভোরবেলা একটা জাহাজের দেখা পেলাম। আমি প্রাণপণে চিৎকার করতে থাকলাম আর কাপড় নাড়তে থাকলাম। দেখলাম জাহাজটা এদিকে এগিয়ে আসছে।

কিছু দূর এসে জাহাজ থামল। একটা ছোট্ট নৌকা করে কাপ্তেন এগিয়ে এলেন। বললেন, শহরের এদিকে আপনি এলেন কি করে?

আমি আমার গল্প বল্লাম।

কাপ্তেন বল্লেন, আমি কাল রাতে এখানে আগুন দেখেছি। এদিকটা আমার অতি পরিচিত স্থান। এদিকে কোন কালে কেউ আসে না। আমি তাই রাতে বিস্মিত হয়েছিলাম। তাই ভোর থেকেই দূরবীণ কষে দেখছিলাম। তাতেই আপনাকে দেখতে পেয়েছি।

কাপ্তেন আমাকে জাহাজে তুলে নিলেন। তাঁর দয়ায় আমি আবার বসরায় ফিরে এলাম। সেখান থেকে বাগদাদে।

এতদিনে আমি বৃদ্ধ কাপ্তেনকে ভালবেসে ফেলেছি। বসরায় নেমে তাঁকে একটা সোনার অলঙ্কার দিতে গেলাম। তিনি নিলেন

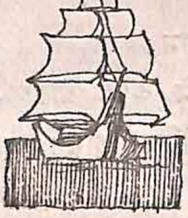
না। বল্লেন, না। বিপদে পড়া মানুষকে উদ্ধার করে ঘরে পৌঁছে দেওয়া নাবিকের ধর্ম। এর জন্য আমি কিছু নেব না বেটা। তবে তুমি যদি দিতে চাও তবে গরীব দুঃখীকে দান করো।

আমি বাগদাদে ফিরে এবার সাতদিন ধরে গরীব দুঃখীকে দান করলাম। এতে আমার মন প্রসন্ন হ'ল। এরপর আমি খুশি মনে আমার স্ত্রী-পুত্র পরিজনের সঙ্গে সময় কাটাতে থাকলাম।

অভ্যাগতেরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বল্লেন, অদ্ভুত আপনার কাহিনী। অদ্ভুত আপনার ধৈর্য, সাহস এবং স্থির-বুদ্ধি।

হাসলেন সিন্দবাদ। বল্লেন, তার পরের অভিযান আরও চমকপ্রদ। কাল বলব সে কাহিনী।

এরপর হিন্দবাদকে একশত মুদ্রার এক তোড়া উপহার দিয়ে বিদায় দিলেন সিন্দবাদ। হিন্দবাদ মনে মনে ভাবতে ভাবতে চল্ল ঐ বিলাসী লোকটির তলায় লুকিয়ে থাকা কঠোর মানুষটির কথা।



পরদিন সকালে নিয়মমাফিক সকলে এসে জমায়েত হলেন সিন্দবাদের বাড়িতে। হিন্দবাদ তখনও সিন্দবাদের দিকে বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে। এই লোকটা কতদিন শুধু মৃত মানুষের সঙ্গে কাটিয়েছে, শুধু রুটির জন্য করেছে নরহত্যা আবার কি অসীম ধৈর্যের সঙ্গে লড়াই করে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছে! আশ্চর্য! এ মানুষ, দানব না দেবতা! হয়ত সত্যকার মনুষ্যত্ব আছে যার, সেই এমন জয়ী হতে পারে।

এ সব ভাবতে ভাবতে হিন্দবাদের মুখ চলছিল না। অন্যদের নাস্তা খাওয়া শেষ হলেও হিন্দবাদ বসে রইল। সিন্দবাদ বললেন, কি হিন্দবাদ। তুমি কি অসুস্থ?

হিন্দবাদ বল্ল, না জনাব! আমি শুধু ভাবছি আপনার কথা। এই আপনাকে দেখে কে বুঝবে যে তলায় অজস্র দুঃখে পোড় খাওয়া একটা শক্ত মানুষ রয়ে গেছে।

সিন্দবাদ হাসলেন। বল্লেন, দুঃখ এবং সুখ দুইকেই সমানভাবে যারা গ্রহণ করতে পারে তারাই তো মানুষ। হিন্দবাদ! আমি সারা জীবন সেই মনুষ্যত্ব লাভেরই চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি ভুলতে পারি না, আমাকেও প্রাণের জন্য একজন নিরীহ লোককে হত্যা করতে হয়েছিল। সেই পাপ····

অভ্যাগতেরা বল্লেন, জনাব! আপনি যে অবস্থায় ঐ মানুষটিকে খুন করেছেন, সে অবস্থায় অন্য মানুষও তাই করত। সে তো বাঁচার লড়াই। ওতে পাপ নেই।

সিন্দবাদ তবু ঘাড় নাড়তে থাকলেন। বল্লেন, অনিবার্য প্রয়োজনে হত্যায় শাস্ত্রের নিষেধ নেই। বাঁদর দ্বীপের দৈত্যকে অন্ধ করে আমার অনুশোচনা নেই। কিন্তু সেই লোকটিকে আমি ভুলতে পারি না।

বলতে বলতে স্তব্ধ হয়ে রইলেন সিন্দবাদ। একজন বাঁদী তাড়াতাড়ি তাঁকে পানীয় এনে দিল। তিনি পুরোটা পান করে নিলেন। তারপর নিজেই হেসে বল্লেন, ও সব কথা থাক। আসুন, আজকের গল্প শুরু করা যাক। এটা আমার পঞ্চম সমুদ্র অভিযান।

চতুর্থ অভিযান থেকে ফিরে আমি অনেক কাল বাড়িতে কাটালাম। কিন্তু শেষে মনে হতে থাকল যে আমার হাড়-পাঁজরায় বুঝি বা ঘুণ ধরে গেছে। বুক যেন আগের মত নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। অতত্রব আবার পসরা সাজিয়ে রওনা হলাম জাহাজে।

এবারের সঙ্গীরা আমাকে বেশ তোয়াজ করে রাখত। তারা বারবার করে শুনত আমার কাহিনী। আর বলত যে, আহা, আমরা কোনদিনই এসব কোন কিছুই দেখতে পেলাম না।

আমি হাসতাম।

এমনি করে বড় আনন্দে কাটছিল এবারের দিনগুলো। বন্দরে বন্দরে ব্যবসাও ভালই চলছিল। চার পাঁচটি বন্দরে কাজ সেরে পরের বন্দরে যাবার আগে আমরা এক অচেনা দ্বীপের সন্ধান পেলাম। সকলে সেই দ্বীপে নামতে চাইল। কিন্তু আমি কিছুতেই অজানা দ্বীপে নামতে চাইলাম না।

এমন সময় সব গাছ পালা ছাড়িয়ে এক সাদা প্রাসাদের ছাদ আমাদের নজরে এলো। একটু ভাল করে দেখে বুঝলাম যে ওটি কোন প্রাসাদ নয়। ওটি একটি রক পাখির ডিম।

এ কথা সঙ্গীদের বলতেই তারা আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল। বল্ল, সুযোগ যখন পাওয়া গেছে তখন রক পাখি দেখতে পাই না পাই, রক পাখির ডিম নিজের চোখে দেখে আসব।

আমি বল্লাম, কে জানে ওখানে কোন বিপদ লুকিয়ে আছে। সাধ করে বিপদ ডেকে এনে কি লাভ।

ওরা হাসল। বল্ল, আপনি বুড়ো হয়ে গেছেন। আপনি জাহাজে থাকুন। আমরা এ সুযোগ ছাড়ব না।

সত্যিই ওরা নেমে গেল। আমি জাহাজেই রইলাম। ঘণ্টা-খানেক কেটেছে কি কাটেনি—ওরা দৌড়তে দৌড়তে জাহাজে ফিরে এলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে?

সকলে বল্ল, ওরা রক পাখির ডিম দেখে শুনে ওটা নাড়াবার চেষ্টা করেছিল। সকলে মিলে ঠেলেও সেটা একচুল নাড়াতে পারে নি। তখন কজন দুবুর্দ্ধি করে এক খণ্ড পাথর ছুঁড়ে দেয় ডিমটার দিকে। তাতে ডিম ফেটে গোলা কাদার মত কিসের স্রোত বয়ে আসে। শেষে বেরিয়ে আসে রক পাখির একটি আধ ফোটা বাচ্চা। তাই দেখে ওরা দৌড়ে পালিয়ে এসেছে।

ওদের কাহিনী শুনে আমি বল্লাম, সর্বনাশ করেছ তোমরা। রক পাখি এমনি মানুষের কোন ক্ষতি করে না। কিন্তু যদি বোঝে যে কেউ তার ক্ষতি করেছে, তবে তাকে শেষ করে ফেলে।

ওরা আতঙ্কে বল্ল, তা হলে কি হবে?

আমি বল্লাম, শিগগির এখান থেকে জাহাজ ফিরিয়ে নিয়ে চল। বাচ্চাটির বাবা মা আসবার আগে পালাতে পারলেই মঙ্গল।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজ খুলে দেওয়া হ'ল। পালে দাঁড়ে যত জোরে পারা যায় জাহাজ ছুটান হতে থাকল। মনে হ'ল বিপদ কেটে গেছে। এবার আমরা খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করলাম।

কিন্তু হঠাৎ মনে হ'ল আকাশ মেঘে ঢেকে এলো। কিন্তু মাস্তুলের দিশারী মাঝি চেঁচিয়ে উঠল রক পাখি, রক পাখি।

বাইরে এসে দেখলাম, দু'পায়ে মস্ত পাথর নিয়ে দুটি রক উড়ে আসছে। বুঝলাম পাথর ফেলে ডুবিয়ে মারার ইচ্ছে ওদের।

আমাদের কাপ্তেন দক্ষ লোক। সে পাখির দিকে নজর রেখে হাল ধরে বসে রইল। প্রথম রকটি আমাদের জাহাজ লক্ষ্য করে পাথরটা ছেড়ে দিতেই সে এমনভাবে হাল ঘুরিয়ে দিল যে জাহাজের থেকে অন্তত বিশ হাত দূরে পড়ল পাথরটা। কিন্তু তাতেই যে ঢেউ উঠল তাতে জাহাজটা একেবারে কাত হয়ে গেল। ভলকে জল উঠল জাহাজে। কিন্তু তবু ডোবার হাত থেকে রক্ষা পেলাম আমরা।

কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। দ্বিতীয় রকটা আবার জাহাজকে তাক করছে। এবারেও কাপ্তেন সুন্দর ঘুরিয়ে নিয়েছিলেন কিন্তু বোধ হয় কয়েক সেকেণ্ড দেরি হয়েছিল। অতত্রব পাথরটা এসে পড়ল জাহাজের গলুইতে। মড়মড় করে গলুই ভেঙ্গে পড়ে গেল। আর সেই ভাঙ্গা পথে হু-হু করে জল ঢুকে মুহূর্তে ডুবে গেল জাহাজটা।

নোনা জলে হাবুডুবু খেতে খেতে হঠাৎ এক টুকরো কাঠ পেয়ে গেলাম। বহু কসরৎ করে উঠে বসলাম তাতে।

হঠাৎই প্রবল বাতাস বইতে থাকল। আমার কাঠের ভেলা ছুটে চল্ল হাওয়ার বেগে। শুধু ভয় হতে থাকল, কোন হাঙ্গর তিমিতে পা কেটে না নেয়।

যা হোক, ভাগ্য ভাল, একদিন এক রাতের মধ্যে আমি ডাঙ্গার সন্ধান পেলাম। ক্লান্ত শরীর। অবসন্ন দুটি পা। নুনজলে একেবারে জরে গেছে। তাই ডাঙ্গার সন্ধান পেলেও কোনক্রমে খানিকটা উঠে বালির ওপরেই শুয়ে পড়লাম।

বিকেল পর্যন্ত বিশ্রাম করে শরীর একটু সুস্থ হল। কিন্তু প্রচণ্ড খিদে। সামনে তাকিয়ে দেখলাম। প্রচুর গাছ গাছালি। কি জানি কি অপেক্ষা করছে সেখানে।

ভয়ে ভয়েই গেলাম। গিয়ে কিন্তু চোখ মন জুড়িয়ে গেল। মখমলের মত মসৃণ ঘাসের গালিচা পাতা। গাছে গাছে ফল পেকে সোনালী হয়ে আছে। সামনে ঝরণা বয়ে চলেছে ঝির্ ঝির্ করে। কি মিষ্টি সুরে গান গাইছে পাখি। আমি কি বেহেস্তে এসে পৌঁছেছি। আল্লা কি এই সুন্দর উপহার দেবার জন্যই এবার বিপদে ফেলেছিলেন!

গাছ থেকে পেড়ে ফল খেলাম। জল খেলাম ঝরণা থেকে। তারপর রাত কাটাবার জন্য গাছে উঠে বসলাম। দেখলাম গাছটাতে পাখির বাসা আছে। অতএব সেই সাপের রাজ্যের মত দশা না হতেও পারে।

আধ ঘুমে আধ জাগরণে রাত কাটালাম। কিন্তু রাতে কোন বিপর্যয়ই ঘটল না। না! দ্বীপটা সত্যিই সুন্দর। বিপদ নেই। পাখির ডাকে ঘুম থেকে জেগে উঠে নিচে নামলাম। হাতমুখ ধুয়ে আবার ফল খেলাম। তারপর দ্বীপটা ঘুরে দেখতে বের হলাম।

দ্বীপটার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য সীমাহীন। দুচোখ ভরে দেখতে দেখতে এক ছোট্ট জলপ্রপাতের কাছে এসে পৌঁছলাম। প্রপাতের ওপরে একটা সেতু। কে তৈরি করল কে জানে। গেলাম সেখানে। পার হলাম।

ওপারে গিয়ে দেখি এক বৃদ্ধ বসে আছে। তার চোখে হতাশা। মুখে চোখে কোন ভাব নেই। মনে হল আমারই মত কোন হতভাগ্য। কোন জাহাজডুবি বা কোন রকমে এসে পৌঁছেছিল এই দ্বীপে। জনশূন্য এই বনে একজন মানুষ দেখে খুশিই হলাম। বল্লাম, কি মশাই! এমন ভাবে বসে আছেন কেন? আপনারও নৌকাডুবি হয়েছিল নাকি?

বৃদ্ধ কোন উত্তরই দিল না। শুধু চোখ তুলে তাকাল আমার দিকে। তারপর মিনতিভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিতে ওপারে পৌঁছে দিতে বল্ল।

আমার ভারী মমতা হল। অক্ষম বুড়ো মানুষ, কে না দয়া করে তাকে! ধরে তুলে তাকে কাঁধে বসালাম। কিন্তু কাঁধে বসেই বুড়ো দুই দাবনা দিয়ে আমার গলা এমনভাবে চেপে ধরল যে আমার দম বন্ধ হয়ে এলো। দুই হাতে চেপে ধরল আমার চুলের মুঠি। তারপর ঘোড়ার লাগাম টেনে যেমন করে লোকে ঘোড়াকে বুঝিয়ে দেয়, কোন দিকে চলতে হবে, তেমনি করে চুলের মুঠি ধরে ঘাড় ঘুরিয়ে বুঝিয়ে দিল।

আমি বল্লাম, সেখ, এ কি ব্যবহার।

সে পায়ের পাতা দিয়ে পাঁজরে এমন গুঁতো মারল যে আমি ককিয়ে উঠলাম। সে ঘাড়ে বসে শরীর দুলিয়ে এমন ঝাঁকি মারতে লাগল যে আমি না ছুটে নিস্তার পেলাম না। ছুটতে ছুটতে হঠাৎ

থেমে ওকে ঝাঁকি দিয়ে ফেলে দিতে চাইলাম। কিন্তু বুড়ো আঠার মত এঁটে রইল। আর আমার অবাধ্যতার শাস্তি দিতে এত জোরে চুল টেনে ধরল যে বোধ হতে থাকল যে মাথার খুলি থেকে বুঝি চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে আসবে। আমি আর্তনাদ করে উঠলাম। বুঝলাম, আমি এক অদ্ভুত বুড়োর খপ্পরে পড়েছি। আমি ওর পোষা বাহনে পরিণত হয়েছি।

নিয়তিকে আমি কোন দিনই মেনে নিতে পারিনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে ফন্দি স্থির করে নিলাম। অবাধ্যতা করে এর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। অসম্ভব জোর এর হাতে পায়ে। ফন্দিও কম জানে না। অতএব বাধ্যতা দিয়েই ওকে কায়দা করতে হবে।

বুড়ো দিনে রাতে কখনই আমার কাঁধ থেকে নামত না। রাতে ঘুমের মধ্যেও শক্ত করে জড়িয়ে রাখে তার লোহার মত দুটো ঠ্যাং দিয়ে। আমি লক্ষ্য করলাম বুড়ো আমাকে দিয়ে ফল সংগ্রহ করে। খায়। আর খানিকক্ষণ প্রমোদে ঘুরে বেড়ায়। আমি যেন তার ঘোড়া। সে আমার মালিক। তাই আমাকেও খেতে দেয়। খুশি হলে দেয় পুরস্কার।

এমন ঘোড়া হয়েই কাটিয়ে দিতে হ'ল কয়েক সপ্তাহ। কি দুর্বিসহ জীবন। নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছার কোন বালাই নেই। ঐ বুড়োর মর্জি মাফিক ছুটতে হবে, বসতে হবে, চলতে হবে।

ইতঃমধ্যে হঠাৎ একদিন এক বনে এক রাশ আঙ্গুরের গাছের সন্ধান পেলাম। কয়েকটা আঙ্গুর ছিঁড়ে খেতে দিলাম বুড়োকে। বুড়ো খুব খুশি। সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি স্থির করে ফেললাম।

কদিন আগে এক জায়গায় লাউ গাছ দেখেছিলাম। ছুটলাম সেখানে। একটা লাউয়ের ভেতর থেকে শাঁস বের করে ফেলে দিলাম। লাউটাকে শুকোতে দিলাম রোদে। বুড়ো এটাকে আমার খেলা ভেবে কিছু বল্ল না।

কয়েকদিনে লাউ-এর খোলা শুকিয়ে গেল। এবার আবার গেলাম আঙ্গুর বনে। বুড়ো অনেক আঙ্গুর খেল। আমাকে যে কটা



দিল, সব আমি চট্‌কে ঐ খোলে রেখে দিলাম। বুড়ো চোখ বড় বড় করে দেখল। আমি ঐ খোল এক জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিলাম।

আরও এক সপ্তাহ কেটে গেল। এবার একদিন গিয়ে ঐ খোল বের করলাম। আঙ্গুর রস সুন্দর গেঁজে উঠেছে। তৈরি হয়েছে কড়া মদ। আমি আঙুল দিয়ে একটু চেটে তারিফ করবার ভঙ্গি করলাম। তারপর খোল ধরে বুড়োকে দেখিয়ে দেখিয়ে চুমুক দিতে গেলাম।

বুড়ো ছোঁ মেরে আমার হাত থেকে ঐ লাউ-এর খোল নিয়ে নিল। নিজে প্রথমে একটু চাখল। টক-মিষ্টি-ঝাঁঝাল রস ভালই লাগল বুড়োর। সে চোঁ চোঁ করে সবটা খেয়ে নিল।

আমি এটাই চাইছিলাম। আমি জানতাম ঐ কড়া মদ বুড়ো সহ্য করতে পারবে না। বেহুঁশ হবেই। সেই আমার সুযোগ। আমি অধীর আগ্রহে সেই বেহুঁশ হওয়ার অপেক্ষা করতে থাকলাম।

সত্যিই এক সময় বুড়ো বেহুঁশ হয়ে এলিয়ে পড়ল। শিথিল হ'ল তার পায়ের বাঁধন। খুলে পড়ল চুল ধরা মুঠি। আমি এক ঝাঁকুনিতে মাটিতে ফেলে দিলাম বুড়োকে। তারপর আক্রোশে ওর গলায় পা দিয়ে নাবতে শুরু করলাম। জিব বেরিয়ে বুড়ো এলিয়ে পড়ল। তাতেও আক্রোশ মিটল না আমার। ওর গলায় লতা জড়িয়ে ঝুলিয়ে দিলাম গাছে। ও কোনক্রমেই বেঁচে উঠে যেন আর কাউকে ঘোড়া না বানাতে পারে তার ব্যবস্থা করলাম।

মন সুস্থ হ'ল। এবার স্নান করলাম ঝরণার জলে। খুশিমত ফল খেয়ে একটা টানা ঘুম দিলাম। তারপর সমুদ্রতীরে ছুটলাম জাহাজের সন্ধানে।

কি সৌভাগ্য! তখুনি সেখানে নোঙর করেছে একটি জাহাজ। লোকজন নামছে। আমি তাদের কাছে গিয়ে বল্লাম, কেন এখানে নামছেন আপনারা! এখানে তো লোক বসতি নেই।

কাপ্তেন বল্লেন, জানি। তবে এখানকার ঝরণার জল খুব সুস্বাদু। ফলও। আমরা এখান থেকে জল আর টাটকা ফল সংগ্রহ করে

নেব। এই বলে কাপ্তেন তার লোকদের সেই বুড়ো সম্পর্কে সাবধান করে দিল।

আমি বল্লাম, আর ভয় নেই কাপ্তেন। সে বুড়োকে আমি শেষ করেছি।

কাপ্তেন বল্ল, বল কি! তার হাত থেকে কেউ তো রেহাই পায় না। তাই তার নাম সমুদ্র শয়তান। কিভাবে তাকে শেষ করলে?

আমি সব খুলে বল্লাম। কাপ্তেন বল্ল, তোমার মত লোক আমি দেখিনি। নিজের ধৈর্য আর বুদ্ধির জোরে তুমি নিজেই শুধু বাঁচ নি, ভবিষ্যতেও যাতে কেউ বিপদে না পড়ে তারও ব্যবস্থা করেছ। তুমি সমস্ত নাবিকদের আশীর্বাদ পাবে।

ঐ কাপ্তেন আমাকে মহা সমাদরে জাহাজে তুলে নিলেন। আমাকে নতুন সাজ পোশাক দিলেন। আবার আমরা যাত্রা করলাম।

পথে দুটি দ্বীপে নেমেছিলাম আমরা। সে দুটিও আশ্চর্য দ্বীপ। প্রথম দ্বীপে একটা সুন্দর শহর আছে। লোকে একে বলে বাঁদর শহর। এই বাঁদরদের জন্যই শহরের চারদিকে মস্ত প্রাচীর। বাঁদরেরা বাস করে শহরের বাইরে। শহরের বাইরে আছে এক রকম অসংখ্য গাছ। সে গাছ আমাদের দেশে নেই। লম্বা উঁচু গাছের মাথায় এক রকম ফল হয়। একে সে গাছে ওঠা অসাধ্য, তায় গাছে থাকে বানরেরা। তাই সে ফল পাওয়া কষ্টকর। অথচ ফল খুব সুস্বাদু।

আমরা থলি বোঝাই নুড়ি নিয়ে গিয়ে বাঁদরদের মারতাম আর ওরা ক্ষেপে গিয়ে সেই ফল ছুঁড়ে মারত। আমরা তখন সে ফল কুড়িয়ে নিতাম। এমনি করে সেবারে ফল কুড়িয়েই অনেক অর্থ করলাম।

দ্বিতীয় দ্বীপটিকে বলে ঝিনুক-দ্বীপ। সেখানে ডুবুরীদের বাস। তারা ঝিনুক তোলে। ঝিনুকে থাকে মুক্তো। সব ঝিনুকে নয়—কোন কোন ঝিনুকে। সেই দ্বীপে পৌঁছে আমরাও মুক্তোর

সন্ধানে নেমে পড়লাম। এবারে আমার নসিব প্রসন্ন। আমি যতগুলো ঝিনুক তুল্লাম তার বেশির ভাগ ঝিনুকেই মুক্তো ছিল।

এমনি করে অনেক ঐশ্বর্যের মালিক হয়ে আমি ফিরে এলাম নিজের বাড়িতে। আমাকে ফিরে পেয়ে আমার আত্মীয়েরাও যেমন আনন্দিত হলেন, তেমন আমিও আনন্দিত হ'লাম। সুখে আমার দিন কাটতে থাকল।

এ কাহিনী বলা শেষ করে সিন্দবাদ সেদিনও হিন্দবাদকে একশ' মোহর উপহার দিলেন। সকলকে পরদিন উপস্থিত হয়ে তাঁর ষষ্ঠ অভিযানের কাহিনী শুনতে নিমন্ত্রণ জানালেন।

সকলে ফিরে আসবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিল।



পরদিন ভোরে সবাই এসে জমায়েত হলে সিন্দবাদ তাঁর ষষ্ঠ অভিযানের কথা বলতে শুরু করলেন। তিনি বলতে থাকলেন—

এবার বাড়ি ফিরে আমি বেশ খুশিতে মসগুল ছিলাম। আর সমুদ্র যাত্রার ইচ্ছে আদৌ ছিল না। সম্পদ জমেছিল প্রচুর। লোককে বলবার মত গল্পও কম নয়। দেখাবার জিনিসও জমেছিল অনেক। অতএব বাকি জীবনটা হেসে খেলেই কাটিয়ে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু বোধ হয় আমার জন্মলগ্নে কোন দুষ্টগ্রহ ছিল। সে আমাকে স্থির থাকতে দিল না। আবার টলিয়ে নিয়ে গেল অথৈ সমুদ্রে।

একদিন বিকেলে দোতলার ঝুল বারান্দায় বসে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ নজরে এলো পথ দিয়ে চলেছে একদল ভিনদেশী বণিক। ওদের দেখেই আমার বুকের রক্ত কেমন উছলে উঠল। আমি ছুটে নেমে গেলাম ওদের কাছে। বল্লাম, কোথায় চলেছেন আপনারা ?

ওরা বল্ল, আমরা নতুন এসেছি বাগদাদে। পসরা বিকিয়ে রওনা হব কয়েক দিনের মধ্যে।

জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় উঠেছেন আপনারা ?

ওরা বল্ল, সরাইখানায়।

ওদের নিয়ে এলাম নিজের বাড়িতে। তলায় তলায় প্রস্তুত হতে থাকলাম ওদের সঙ্গে যাত্রার জন্য। কাউকে কিছু না বলেই প্রস্তুত হতে থাকলাম। বুকের ভিতর সে কি উত্তেজনা। আবার জাহাজ ভাসবে, ফুলে উঠবে পাল, সিন্ধু শকুনেরা মাথার ওপর পাক খেতে থাকবে, শত-সহস্র ঢেউ তুলে সমুদ্র আছড়ে পড়ে মিতালি করতে চাইবে আমাদের জাহাজের সঙ্গে……আমার ঘুম চুলোয় গেল, খাওয়া বন্ধ হল। কবে যাত্রা করবে গো বণিকের দল, কবে যাত্রা করবে !

এল সেই দিন। যাত্রা করলাম। প্রথম উটে চড়ে। কোথাও বা পায়ে হেঁটে। এসে পৌঁছলাম বসরায়। সেখান থেকে এক বিশাল জাহাজে চড়ে বসলাম। আঃ, কি মুক্ত আকাশ। যতদূর চোখ যায় মুক্তি, মুক্তি। মেহেমানগণ আপনারা জানেন না যে এমন অবারিত মুক্তির মধ্যে মন কি আনন্দেই না ভরে ওঠে!

এই আনন্দের মধ্যেই একদিন কাপ্তেন চিৎকার করে উঠল, সর্বনাশ হয়েছে। আমি দিশা হারিয়েছি। অচেনা সমুদ্রে এসে পড়েছি। কোথায় চলেছি বুঝছি না।

সকলে হাঁউ মাউ করে কেঁদে উঠল।

আমি বল্লাম, কেঁদে কোন লাভ নেই বন্ধুরা। অজানা সমুদ্র বলেই দুর্ভাবনার কিছু নেই। দু-এক দিনের মধ্যে অন্য জাহাজের সাক্ষাৎ মিলতে পারে। তারা সব হদিশ দেবে। আর তা যদি না-ও হয়, তবু ভয়ের কিছু নেই। অজানা সমুদ্র অর্থই বিভীষিকা নয়।

আমার কথায় আশ্বস্ত হ'ল অনেকেই। আমি আমার আগেকার অভিযানগুলির গল্প বলে ওদের চাঙ্গা করে তুল্লাম। কাপ্তেন মাস্তুলের ওপরে উঠে গেল। সে সেখান থেকে নজর রাখতে লাগল চারদিকে।

তৃতীয় দিনে সে চেঁচিয়ে উঠল, ডাঙ্গা দেখতে পেয়েছি, ডাঙ্গা!

আনন্দে সকলের মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যতগুলো দাঁড় ছিল, সব নামান হ'ল। জাহাজ দ্রুত এগুতে থাকল ডাঙ্গার দিকে। কিন্তু বিপত্তি দেখা দিল বিকেলে। আকাশে মেঘ। মেঘ গাঢ় হ'ল। শুরু হ'ল প্রবল ঝড়। ঝড়ে জাহাজটাকে যেন লোফালুফি করতে লাগল। জাহাজ এসে পড়ল ডাঙ্গার কাছে। অবশেষে এক সময় ডাঙ্গার খাড়া পাহাড়ের গায়ে আছড়ে পড়ে জাজাজটা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল।

বোধ হয় মাথায় আঘাত লেগেছিল আমার। আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম জলে ডোবা পাথুরে জমির উঁচু নিচু খাঁজে আটকে আছি।

উঠে বসলাম। অন্যেরা কোথায়! আর কারো হদিশ পেলাম না। আল্লা যেন রঙ্গ করবার জন্যই একা আমাকে বাঁচিয়ে রেখে ওদের কোলে টেনে নিয়েছেন।

কি করব আমি! একদিকে খাড়া পাহাড় অন্য দিকে সমুদ্র। পাহাড়ে ওঠা দুঃসাধ্য। সমুদ্র তো অপার। তবে? অল্প জলে পাহাড়ের ধার ধরে এগুতে থাকলাম।

একবেলা চলতে না চলতেই হঠাৎ এক জায়গায় পাহাড় এসে মিশে গেছে বেলাভূমিতে। আমি তাকিয়ে দেখলাম, অন্যদিকে যতদূর চোখ যায় পাহাড় চলেছে ত' চলেছেই। ভাগ্যে এদিকে এসেছিলাম।

এই বেলাভূমিতে এসে অবাক হলাম। এ যেন শত শত জাহাজের সমাধি ক্ষেত্র। বুঝলাম কোন নৈসর্গিক কারণে এদিকে জাহাজ এলেই তা এসে ধাক্কা খায় ঐ পাহাড়ে। জাহাজ ডুবি হয়। আর সমুদ্রের ঢেউ সঞ্চয়ীর মত সব এনে জমা করে এই বেলাভূমিতে।

কতকাল ধরে এখানে জমেছে ডুবো জাহাজের ঐশ্বর্য। এখানে জাহাজের কাঠ দড়ি লোহার টুকরো তো আছেই, আছে কত শত বাণিজ্যদ্রব্য, টাকার থলি, আরও আরও দামী উপকরণ। কবরখানায় গেলে মন যেমন উদাস হয়ে যায়, কখনও বা কান্না পায়, আমার সেই দশা হল।

কিন্তু বসে থাকবার সময় নেই। ওর ভেতর একটা কুড়ুল নজরে পড়ল। ভাল অস্ত্র। সেটি হাতে নিয়ে দ্বীপের ভিতরে প্রবেশ করলাম।

জানতাম কাছাকাছি মানুষ নেই। কাছে মানুষ থাকলে নিশ্চয় এখানে এত ঐশ্বর্য পড়ে থাকত না। তবে মানুষ নেই বলে যে অন্য প্রাণী বিশেষত হিংস্র প্রাণী নেই—তা কে বলবে! অতএব সতর্ক হয়ে এগুতে থাকলাম।

খানিক বালিয়াড়ি ভেঙ্গে পাতলা অরণ্য। সবই বনস্পতি জাতীয় গাছ। তার না আছে ফুল না ফল। এখনও পর্যন্ত কোথাও

কোন কিছু নজরে পড়েনি, যা খাওয়া যেতে পারে। তবে কি এখানে না খেয়ে মরতে হবে!

আরও এগুতে মিষ্টি সুবাসে মন মেতে উঠ্‌ল। কানে আসতে থাকল মিঠে জল তরঙ্গের ধ্বনি! তবে কি আমি কোন অপ্সর-অপ্সরার রাজ্যে এসে পড়লাম! ভয়ে বিস্ময়ে আর কৌতূহলে এগুতে থাকলাম আমি।

কিছুদূরে এগুতেই একটি নদী দেখতে পেলাম। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে নিচে। নিচে অসংখ্য নুড়ি পাথর। স্রোতে তার থেকেই অমন মধুর আওয়াজ উঠছে। নুড়িগুলির দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। তার প্রত্যেকটি মূল্যবান পাথর। হয় চুনি নয় পান্না। পৃথিবীর কোন রাজভাণ্ডারেও অত ঐশ্বর্য সঞ্চিত নেই। কয়েকটা নুড়ি হাতে তুলে নিতে গিয়ে দেখলাম, নদীতীরের বালিতে প্রচুর পরিমাণে সোনার গুঁড়ো মিশে আছে। সত্যিই যেন আমি রূপকথার রাজ্যে এসে পৌঁছেছি।

আশ্চর্য। নদীটা পাহাড় থেকে নেমে এসে কিছু দূর গিয়ে আবার ঢুকে পড়েছে পাহাড়ের এক সুড়ঙ্গে। কোন পথে কোথায় বেরিয়েছে তা কে জানে!

গন্ধটা ক্রমেই বেড়ে উঠছে। গন্ধের উৎস খুঁজতে পাহাড়ে উঠলাম। অবশেষে দেখতে পেলাম, আর এক ঝর্‌ণা। এমন ঝর্‌ণা আমি জীবনে দেখিনি। সে ঝর্‌ণার জল ঘোর কালো। সে জল লাফিয়ে নামছে সোজা সমুদ্রে। লোভী মাছেরা সেখানে এসে সেই জল পেটপুরে খাচ্ছে। তারপর উগরে দিচ্ছে মুখ থেকে। ওগরান জল হালকা মোমের মত ভেসে উঠছে জলের ওপর। তার থেকে উঠছে ঐ মিষ্ট গন্ধ।

আশ্চর্য দেশ! অবাক করা নদী, অবাক করা তার তীরভূমি। অবাক করা তার ঝর্‌ণা। বিচিত্র স্বভাব এখানকার মাছের। তার চাইতেও অবাক করা ঐ মোমের মত সুগন্ধী।

বলতে বলতে একটি কাঁচের পাত্র খুলে দিলেন সিন্দবাদ। সকলে গন্ধে আমোদিত হয়ে দেখলেন লালচে মোমের মত খানিকটা

কি রয়েছে সেই পাত্রে। সিন্দবাদ বল্লেন, এর গন্ধ আগের মতই তাজা রয়েছে। এ গন্ধ বুঝি বা কখনও শেষ হবে না।

মেহেমানেরা সিন্দবাদকে আবার গল্পের খেই ধরতে অনুরোধ করলেন। সিন্দবাদ বলতে শুরু করলেন ঃ—

ঐ ঐশ্বর্য আর গন্ধ পেয়ে যত অভিভূতই হই না কেন, আমার শরীর আর বইছিল না! এখন পর্যন্ত গোটা অঞ্চলে কোন খাদ্যদ্রব্য দেখতে পাইনি। ঐ মাছ ধরবার কৌশলও জানি না। ও মাছ খেলে কোন বিষক্রিয়া হবে কি না, তাই বা কে জানে! ভয়ে ভয়ে প্রথম ঝর্ণা থেকে এক আঁজলা জল খেলাম। না, জলটা অপেয় নয়। জল ছাড়া খাবার আর কিছুই নেই! তবে কি না খেয়ে শুকিয়ে মরতে হবে এদেশে!

সারারাত পাহাড়ের ওপর একটা সমতল জায়গায় শুয়ে কটিয়ে দিলাম। স্থির করলাম নিশ্চেষ্ট হয়ে মরব না। যা থাকে কপালে, ভাঙ্গা জাহাজের কাঠ দিয়ে ভেলা বানিয়ে নদীর ঐ সুড়ঙ্গেই ঢুকে পড়ব। মরি তো বাঁচবার চেষ্টা করেই মরব।

পরদিন ভোরে উঠে কাজে লেগে গেলাম। দুপুরের মধ্যে বেশ পোক্ত একটা ভেলা তৈরি হয়ে গেল। কয়েকটা বাক্সজাতীয় জিনিসে ভরে নিলাম কিছু বড় বড় পান্না-চুনী। কুড়ালটা তো ছিলই। একখানা ভাল তলোয়ারও পেলাম। তারপর আর একবার পেট পুরে নদীর জল খেয়ে আল্লার নাম স্মরণ করে ভেসে পড়লাম নদীর জলে। দেখতে দেখতে আমার ভেলা সুড়ঙ্গে ঢুকে পড়ল।

অন্ধকার। দিনরাত্রের ভেদ নেই। সেই কবরে তবু খানিকটা হেঁটে বেড়ান যেত। এতে মাথা উঁচু করতেও ভয় হয়। যদি কোথাও সুড়ঙ্গ খুব নিচু হয়! অতএব বেশির ভাগ সময় বসে বা শুয়ে কাটাতে থাকলাম।

বেশ জোরেই ছুটে চলেছে ভেলা। আমার ক্রমেই ভরসা বাড়ছে। যে ভাবে ভেলা চলেছে তাতে মনে হচ্ছে এ জলস্রোত

এক সময়ে নিশ্চয় পাহাড়ের বুক থেকে আমাকে আলোর রাজ্যে টেনে বের করে নিয়ে যাবে। কিন্তু কবে!

শুধু জল খেয়ে কতদিন বাঁচা যায়! নরখাদকের দেশে খাবার না খেয়েই ত' বাঁচতে পেরেছিলাম। মনের জোর ফিরিয়ে আনতে পারলাম। অতীতের কাহিনীগুলো ভাবতে ভাবতে সময় কাটাতে থাকলাম।

ক'দিন ক'রাত কেটে গেছে জানি না। তখন আমার আর ওঠবার শক্তি নেই। মাঝে মাঝে হাত বাড়িয়ে আঁজলা ভরে জল নিয়ে খাই আর চোখ বুজে শুয়ে থাকি। শরীরে কোন ভার নেই। মনে হয় গোটা দেহ আমার বাতাস দিয়ে তৈরি। চোখ খুলতেও ইচ্ছে করে না। মনে হয়, এমনি করেই এক সময় মৃত্যু এসে অধিকার করবে আমার জীবন। আল্লা! আর কি আমি আলোর দেশে পৌঁছব না।

অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, ক্লান্তিতে আর দুর্বলতায় হয়ত আমি জ্ঞান হারিয়েছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য এই যে ঐ অবস্থাতেই এক সময় জলস্রোত আমাকে টেনে নিয়ে এলো সুড়ঙ্গের বাইরে আলোর রাজ্যে। হয়ত কোন বাঁকের মুখে আটকে যায় আমার ভেলা। কৌতূহলে জমে অনেক মানুষ। তারা আমাকে তুলে এনে শুইয়ে দেয় মাটিতে। নানা ভাবে চেষ্টা করতে থাকে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনতে।

জ্ঞান ফিরলে দেখলাম, অনেক লোক আমার দিকে উৎসুখ চোখে তাকিয়ে আছে। ওরা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। কিন্তু ওদের ভাষা আমি কিছুই বুঝলাম না। আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। দেখলাম নদীর ধারেই রয়েছি আমি। অদূরে আমার ভেলা বাঁধা আছে।

আমি ইঙ্গিতে তাদের কাছে খাবার চাইলাম। ওরা ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো। সেই সঙ্গে নিয়ে এলো একজন আমার দেশীয় লোক। সে আমার কাছ থেকে আমার অভিযানের গল্প শুনে নিয়ে



অন্যদের জানালো। দেখলাম আমার প্রতি ওদের চোখে মুখে কি অসীম করুণা ফুটে উঠল। আমি অন্যের প্রতি এত সহানুভূতি অন্য কোন দেশের লোকের কাছে পাইনি। প্রথম দিনেই ভালবেসে ফেল্লাম দেশটিকে।

ওরা আমাকে কাছাকাছি এক বাড়িতে নিয়ে গেল। আমি দিন কয় শুধু খেলাম আর ঘুমালাম। যেটুকু জেগে থাকতাম, ততক্ষণ সেই আরব লোকটি আসত আর ওদের কৌতূহলী নানা প্রশ্নের উত্তর আমার কাছ থেকে জেনে নিয়ে ওদের ভাষায় জানিয়ে দিত। ঐ দোভাষী লোকটির কাছ থেকে ক্রমে আমি কাজ চালাবার মত ওদেশী ভাষা শিখে নিয়েছিলাম।

বিশ্রাম এবং খাদ্য পেয়ে কয়েক দিনে আমি বেশ সবল হয়ে উঠলাম। এবার ওদের গ্রামের প্রধান আমাকে রাজসভায় নিয়ে যেতে চাইলেন। স্বয়ং রাজা নাকি আমার কথা শুনে, আমাকে দেখবার জন্য কৌতূহলের সঙ্গে অপেক্ষা করছেন। আমি আমার সংগ্রহ থেকে বেছে বেছে বড় বড় কটি মণি মুক্তা নিয়ে ঐ দোভাষীকে সঙ্গে করে রাজসভায় চল্লাম।

পথে যেতে দোভাষী আমাকে সে দেশের রাজসভার আদপ কায়দা খানিকটা শিখিয়ে দিলেন। জানলাম দেশটা হিন্দুস্তানের অংশ। রাজ্যের নাম সারণ দেশ। রাজা অতি অমায়িক সজ্জন মানুষ। এ রাজ্যে অতিথিকে প্রায় দেবতার মত মনে করা হয়।

সত্যিই তাই। রাজা স্বয়ং সিংহাসন থেকে নেমে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলেন। যে দেশে আমি পৌছেছিলাম, সে দেশ থেকে কেউ নাকি কোন দিন ফিরে আসে না। আমার ওপর নাকি দেবতার বিশেষ করুণা আছে। নাহলে আমি ওখান থেকে বেঁচে ফিরতে পারতাম না। আমি নাকি মহা পুণ্যবান ব্যক্তি।

মহারাজ আমাকে তাঁর নিত্য সহচর করে নিলেন। আমাকে অন্তঃপুরেও নিয়ে গেলেন। মহারানী, রাজপুত্র, রজাকন্যারা আমার কাছে বসে আমার গল্প শুনলেন, আমার দেওয়া মণি মুক্তাগুলি ওরা

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে বল্লেন, এমন মণিমুক্তা রাজভাণ্ডারেও নেই।

আমি ওদের আন্তরিকতা ও সরলতায় মুগ্ধ হলাম।

মহারাজ জ্ঞানী এবং পণ্ডিত মানুষ। তিনি হারুণ আল রসিদের কথা জানেন। তাঁর রাজ্যশাসন প্রণালী, তাঁর কাহিনী জানবার আগ্রহে নিত্য আমাকে নানা প্রশ্ন করতেন তিনি। আমি আমার সাধ্য মত জানাতাম সব। শুনতে শুনতে হারুণ আল রসিদের প্রতি তাঁর আকর্ষণ আরও বেড়ে উঠল।

দীর্ঘদিন আমি স্বদেশ ছাড়া। এবার দেশে ফিরবার প্রস্তাব করলাম আমি। মহারাজ চুপ করে রইলেন। বল্লেন, স্বদেশ এবং আত্মীয়দের কাছ থেকে কোন মানুষকে দূরে থাকতে বাধ্য করা, তার স্বাধীনতায় হাত দেওয়া। সিন্দবাদ! আমি তা করব না। তোমাকে নিশ্চয় যেতে দেব। কিন্তু আমি যদি মহারাজ না হতাম তবে তোমায় বুকে জড়িয়ে ধরে রেখে দিতাম দেশে। যেতে দিতাম না। তাতে যা পাপ হত তা বরণ করতাম।

মহারাজের এত স্নেহে আমার চোখে জল এল। আমি বল্লাম, আমি সামান্য মানুষ। আমাকে এমন করে বলবেন না মহারাজ!

মহারাজ বল্লেন, তুমি সামান্য মানুষ নও সিন্দবাদ। যে মানুষ দুঃখ আর আনন্দ দুইকেই সমান ভাবে গ্রহণ করতে পারে, যে মানুষ মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়েও হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে না, যে মানুষ বারংবার এমন অভিযানে যাত্রা করতে পরে, তার মত খাঁটি ব্যক্তিত্ব ক'জনের মধ্যে আছে! তোমার মত নির্লোভ, সত্যবাদী মানুষই বা ক'জন দেখা যায়! তোমার মত মানুষ আমার রাজ্যে এসেছে, এতে আমার রাজ্য ধন্য। হারুণ আল্ রসিদের রাজ্যে তুমি জন্মেছ, তাঁর রাজ্যও ধন্য।

আমি মহারাজের পদপ্রান্তে লুটিয়ে তাকে প্রণাম করলাম। সেটাই ওদের সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানাবার রীতি। মহারাজ আমাকে দুহাতে টেনে তুলে ওকে জড়িয়ে ধরলেন।

যাত্রার দিন স্থির হল। শেষ কদিন রাজপুত্র রাজকন্যা এবং রানীমা আমায় তাদের অতিথি করে দিনরাত সঙ্গে সঙ্গে রাখলেন। আমার শুভ যাত্রা কামনা করে মন্দিরে মন্দিরে পূজা দিলেন। দিলেন অজস্র উপহার।

আমি আসবার আগে দুটি দিন সেই গ্রামে কাটিয়ে এলাম। যারা আমাকে উদ্ধার করেছিল, তাদের প্রত্যেককে আমি একটি করে চুনি উপহার দিলাম। দু'দিন আমার খরচে ভোজ হল সারা গ্রামে। সে কি আনন্দ। সে কি উচ্ছ্বাস!

মহারাজ নিজে আমাকে জাহাজ নির্বাচন করে যাত্রার আয়োজন করে দিলেন। আমাকে দিলেন অযত্র উপঢৌকন। আর স্বয়ং বাদশা হারুণ আল রসিদের জন্য দিলেন নানা উপহার আর এক শুভেচ্ছা পত্র। বল্লেন, বাদশাকে বলবে, অনেক দূরে হিন্দুস্থানে রয়েছে তাঁর এক অকৃত্রিম বন্ধু। বাদশার জয় হোক।

মহারাজের সঙ্গে সকলে চিৎকার করে উঠল হারুণ আল রসিদের জয়ধনিতে। আমি জাহাজে উঠলাম। ওদের পুরোহিত আমার মঙ্গল কামনায় মন্ত্র পড়তে পড়তে ফুল ছিটিয়ে দিল। শত শত শঙ্খ বাজল। আমাদের জাহাজ ছেড়ে দিল।

আমি দেখলাম, সারণ রাজ্যের রাজারানী, রাজপুত্র, রাজকন্যা সভাসদেরা তো দাঁড়িয়ে আছেই, সেই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছে এ গ্রামের সমস্ত মানুষ। সকলের চোখ ছলছলে! সত্যিই যেন কোন বিদেশীকে নয়, তাদের কোন আত্মীয়কে বিদায় দিচ্ছে তারা। এদেশের মানুষ যেমন প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে পারে, তেমনটি আর কাউকে দেখলাম না।

সিন্দবাদ কেমন ভাবতন্ময় হয়ে গেলেন। বোধ হয় সেই মুহূর্তে তার মন চলে গেল সেই দেশের ভালবাসার রাজ্যে। কয়েক মুহূর্ত নির্বাক থেকে দীর্ঘশ্বাস ফেলে মোহ কাটিয়ে বল্লেন, ফেরার পথে নির্বিঘ্ন কাটল। আনন্দের সঙ্গেই স্বদেশে ফিরে এলাম। এবারে শুধু ঐশ্বর্য নয়, তার সঙ্গে নিয়ে এলাম আমার বাদশার প্রতি আর

এক রাজ্যের বাদশার শুভেচ্ছা। অন্য কোন বাণিজ্য যাত্রায় আমার এত বড় লাভ হয় নি।

এই বলে সিন্দবাদ তার ষষ্ঠ অভিযানের কথা শেষ করলেন। হিন্দবাদকে দিলেন একশত স্বর্ণ মুদ্রা এবং সকলকে পরের সকালে সমবেত হয়ে তাঁর সপ্তম অভিযানের গল্প শুনতে অনুরোধ করলেন।



পরদিন সকলেই সবিস্ময়ে একটি প্রশ্ন করলেন সিন্দবাদকে। আপনি এতগুলি সমুদ্র যাত্রায় এমনভাবে বিপদগ্রস্ত হয়েও আবার সমুদ্রযাত্রা করলেন !

সিন্দবাদ হাসলেন। বল্লেন, আর কোন সমুদ্র যাত্রার ইচ্ছা আমার ছিল না। ষষ্ঠ অভিযান থেকে যখন ফিরলাম, তখন আমি বাগদাদের সেরা ধনী। বাদশাহের দরবারে আমার স্থান হয়েছে। আমি নতুন দেশের সঙ্গে বাদশার বন্ধুত্বের বাণী এনে দিয়েছি। বাদশা স্বয়ং আমাকে স্নেহ করেন। আমার কাহিনীগুলো শুনতে তিনি ভালবাসেন। আমিও প্রিয়জনদের আসর বসিয়ে রসিয়ে রসিয়ে এসব গল্প বলতে ভালবাসি। খরচ করবার মত দেদার অর্থ আর বলবার মত অতীতের গল্প যার ভাণ্ডারে মজুত, তার মত সুখী কে !

আমি সুখেই বাকী জীবন কাটিয়ে দেব স্থির করেছিলাম।

কিন্তু একদিন স্বয়ং বাদশা আমায় ডেকে পাঠিয়ে বল্লেন, সিন্দবাদ ! আমি সারণ দেশের মহারাজের কাছে তার পত্রের উত্তর পাঠাতে চাই। আমার ইচ্ছা, তুমি নিজে এই পত্র নিয়ে যাও।

বাদশার ইচ্ছে অর্থই আদেশ। আমি নীরবে আমার বার্দ্ধক্য পীড়িত দেহের দিকে তাকালাম। তিনি আমার ইঙ্গিতটি বুঝে ফেল্লেন। বল্লেন, দুশ্চিন্তা করো না। যাত্রাপথ দুটি যাতে ভালভাবে কাটে, তার সব ব্যবস্থা আমি করব। তোমাকে দেব সবচেয়ে ভাল জাহাজ আর যোগ্যতম অভিজ্ঞ কাপ্তেন। নাবিকেরাও হবে অভিজ্ঞ এবং সুদক্ষ। তোমার সব রকম সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের আয়োজন থাকবে তাতে। আর—

আমি বল্লাম, বাদশা ! আপনি আর বলবেন না। ঐসব ব্যবস্থা না থাকলেও আমি আপনার নির্দেশ পালন করব। সমুদ্রযাত্রা আমার

নেশা। সারণ রাজ্যের ভালবাসায় আমার আকর্ষণ আর তার সঙ্গে রইল আপনার ইচ্ছা পূরণ করবার সুযোগ। বাদশা আপনি বলুন আমাকে কবে যেতে হবে।

বাদশা হারুন অল্ রসিদ আমাকে বল্লেন, আমি যাত্রার আয়োজন সম্পূর্ণ করে এনেছি। তোমার অনুপস্থিতিতে তোমার পরিজনদের রক্ষার দায় আমার। আমার শ্রেষ্ঠ সচিবের পদ দিলাম তোমাকে। সেই মর্যাদায় তুমি আমার দূত হিসাবে যাবে। সেই দিন থেকে রাজসভায় আমার আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গেল। আমি রাজসভাতে অতি সম্মানের মানুষ হিসাবে গণ্য হলাম।

বাদশার সেরা জাহাজটি আমার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। তাতে সারণ রাজ্যের জন্য উপহার সাজান হল। একটি চমৎকার রক্তাভ মখমলের বিছানা। এত নরম এত সুখপ্রদ শয্যা কোথা থেকে বাদশা সংগ্রহ করলেন জানি না। ধনী হয়েও অমনটি আর আমি দেখিনি। সঙ্গে রইল একশ প্রস্থ কুফার তৈরী বিখ্যাত পোশাক, আলেকজান্দ্রিয়ার তৈরি অপরূপ রেশম বস্ত্র। বাগদাদের সূতীকর্মের নিদর্শন স্বরূপ কয়েকটি পোশাক রইল মহারানী এবং রাজকুমারীর জন্য। আরও কত রকমের উপহারে যে জাহাজ বোঝাই হ'ল, তার সীমা সংখ্যা নেই। এর উপর রইল একশত আরবী ঘোড়া। আর আমার হাতে দিলেন সোনার পাত্রে ভরা বাদশার উত্তর-পত্র।

অবশেষে একদিন ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বেরিয়ে পড়লাম। মহারাজ আমাকে রাহা খরচ দিলেন দশ হাজার দীনার।

এবারে আমার যাত্রা নির্বিঘ্নে কাটল। প্রায় দু'মাস পর আমরা সারণ দেশে এসে নামলাম। রাজসভায় পৌঁছে আমি মহারাজের হাতে তুলে দিলাম বাদশাহের শুভেচ্ছা-পত্র আর শহরময় মিছিল করে এলো উপহার সামগ্রী। সারা শহরে সাড়া পড়ে গেল। মহারাজ ছুটে এসে আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

একে আমি মহারাজের প্রিয় মানুষ, এতদিন পর তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে পেয়েছেন, তাতে আমি এবারে বাদশাহের দূত

হিসাবে এসেছি—মহারাজের কাছে আমার আদর আপ্যায়নের সীমা রইল না। আমি এবার মহারাজের পরিবারেরই এক অতিথি হয়ে রইলাম।

কিন্তু, এবারে আমার মন পড়ে আছে দেশে। কিছুই ভাল লাগছে না। আমি মহারাজের কাছে ফিরবার অনুমতি চাইলাম।

মহারাজ বল্লেন, সিন্দবাদ! কতদিন পরে তোমাকে কাছে পেলাম। এবার এত তাড়াতাড়ি তোমাকে ছাড়ব না। এবার তোমাকে অনেক দিন থাকতে হবে।

আমি বল্লাম, তা কি হয় মহারাজ। এবার তো আমি স্বেচ্ছাধীন নই। এবারে আমি বাদশা হারুণ আল্ রসিদের দূত। দ্রুত আমার কর্তব্য সমাধান করে ফিরে যাব—এমনই আমার ওপর বাদশার নির্দেশ।

মহারাজ শুনে বল্লেন, তোমার কথা যুক্তিযুক্ত। মানতে ইচ্ছে না হলেও মানতে হবে। তবে তোমার যাত্রার আয়োজন করতে যে ক'দিন লাগে সে কদিন তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।

আমি আভূমি নত হয়ে বল্লাম, আপনার অভিরুচিই আমার শিরোধার্য মহারাজ!

আমাদের ফিরতি যাত্রার আয়োজন করে দিতে মহারাজের দিন পনের সময় লাগল। তিনি বাদশার শুভেচ্ছার উত্তর দিলেন, দিলেন উপহার। আমাকেও অনেক উপহার দিলেন। শুভদিনে যাত্রা করলাম।

এবার সোজা বসরা। সেখান থেকে বাগদাদ। পরিবেশ অনুকূল। ঝকঝকে আকাশ। হাওয়ার গতি ভাল। জাহাজ তরতর করে এগিয়ে চলেছে। মাঝে একবার জাহাজ থামল সিন্ দ্বীপে। এখানে খাবার জল বোঝাই হ'ল জাহাজে। আমি দ্বীপটা ঘুরে দেখলাম। মোটামুটি জনবহুল; আর্থিক অবস্থা ভালই ওদের। ব্যবসার পক্ষে দেশটা মন্দ নয়। কিন্তু এবারে আমার তো বাণিজ্য যাত্রা নয়—অতএব সে দিকে তেমন নজর না দিয়ে দেশটার সৌন্দর্যই দেখলাম।

সিন দ্বীপ ছাড়লাম তিন দিন পর। এর পর হাওয়ার বেগ বাড়ল। খুশিই হ'লাম আমরা। দ্রুত দেশে পৌঁছব। কাপ্তেনও খুশি। কিন্তু সপ্তাহ খানেক পর থেকেই কাপ্তেনর মুখ শুকনো দেখলাম। দিন দশেক পর কাপ্তেন আমার কাছে এসে একবারে ভেঙ্গে পড়ল। বলল, সর্বনাশ হয়েছে। আমরা কোথায় এসে পড়েছি কিছুই বুঝছি না।

আমি বল্লাম, কি ভাবে তা হ'ল !

কাপ্তেন বল্ল, কয়েক দিন আগে থেকে আমার যন্ত্র সব বিগড়েছে। ভেবেছিলাম, দিক ঠিক আছে, ঠিকই চলছে জাহাজ। কিন্তু আজ বুঝতে পারছি দিকও ঠিক নেই। আমরা পথ হারিয়েছি।

আমি বল্লাম, যা হয়েছে তা আর কারো কাছে বলবেন না। জাহাজ যেমন চলছে চলুক। থেমে থেকে লাভ নেই।

দিন দুয়েক পর দূরে একটা দ্বীপ দেখা গেল। কিন্তু দ্বীপটার কাছে আসতেই কাপ্তেন বলল, একি দুর্দৈব! আমরা সোলেমানের সমাধি দ্বীপের কাছে এসে পড়েছি। এখানে এসে কেউ প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারে না। শিগ্‌গিরি মুখ ফেরাও।

সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের মুখ ফেরান হ'ল। কিন্তু দুর্বিপাক বাড়ল বিকেলে। আকাশে মেঘ দেখা দিল। আমাদের সঙ্গে যে মোল্লা ছিল সে চিৎকার করে উঠল, হা আল্লা, ও তো মেঘ নয়, ও যে পয়গম্বর সোলেমানের বাহিনী।

আমি বল্লাম, তাতে কি হবে ?

মোল্লা কোন উত্তর না দিয়ে তার বাক্স থেকে একটা কি পুঁথি বের করল আর বের করল কিসের সাদা গুঁড়ো। ঐ গুঁড়ো ময়দার মত মেখে তাকে কানে গুঁজে সে ঐ পুঁথি থেকে কি সব মন্ত্র তন্ত্র পড়তে থাকল। নাবিকেরা তারস্বরে আল্লা আল্লা ডাক ছাড়তে থাকল।

আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই যেন সমুদ্রের পারাপার থেকে একদল সৈন্য হৈ হৈ করে এগিয়ে আসছে। কি দুর্ধর্ষ তাদের বেগ, কি দুর্বিনীত তাদের সহর্ষ গর্জন। যেন লাখ

লাখ সৈন্য একসঙ্গে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল আমাদের জাহাজের ওপর। তারপর এক লহমায় হাতের পাতায় তুলে তাকে ছুঁড়ে মারল সোলেমানের সমাধি দ্বীপে। আমাদের জাহাজ চুরমার হয়ে কোথায় কি হ'ল তা বুঝবার আগেই আমার সব বোধ লোপ পেল।

যখন জ্ঞান ফিরল তখন আমি আধ-জল আধ-ডাঙ্গায় শুয়ে আছি। তা হলে বেঁচে গেছি আমি। সোলেমানের সৈন্য বাহিনী জাহাজের ক্ষতি করলেও আমাকে রক্ষা করেছে। ধীরে ধীরে উঠে বসলাম। দ্বীপের ভেতর দিকে তাকাতেই চোখ জুড়িয়ে গেল। সবুজে সবুজ দ্বীপটি। মাঝে মাঝে এক একটা ন্যাড়া গাছ বোঝাই লাল লাল ফুল। তাহলে এই দ্বীপটিই তো আমরা আগে দেখেছিলাম। কাপ্তেন একেই বলেছিল সোলেমানের সমাধি! সত্যিই সমাধি স্থানের মতই নির্জন শব্দহীন, স্তব্ধ! কে জানে, এখানে যারা আসে তাদেরও সমাধিই গ্রহণ করতে হয় কি না!

বেলাভূমি পার হয়ে দ্বীপে ঢুকতেই দেখলাম শুধু ফুল নয়, অজস্র ফলেও ভরা দ্বীপটি। ফল খেয়ে, পাশের এক সরোবর থেকে জল খেলাম। শরীর অনেক চাঙ্গা হ'ল। তারপর বেলাভূমির চারদিকে খুঁজলাম আমার জাহাজের সঙ্গীদের। কাউকেই পেলাম না। আল্লা তা হলে একা আমাকেই বাঁচিয়ে রেখেছেন! আমি আল্লার কাছে দোয়া প্রার্থনা করলাম।

পর দিন একটা নদী খুঁজে পেলাম। মনে ভারী আশা হ'ল যে এই সমাধির দেশ থেকেও তা হলে পার পাওয়া যাবে! বন থেকে শুকনো গাছ খুঁজে বের করলাম। তার ডাল দিয়ে তৈরি হ'ল ভেলা। বনে খুঁজতে খুঁজতে এক রকম আশ্চর্য সুগন্ধী গাছ পেলাম। এ গাছ আমি আগে দেখি নি। আগের ঝড়ে ভেঙ্গে পড়া ঐ গাছের ডালগুলো এনে জড়ো করলাম আমার ভেলার দুপাশে। এতে ভেলার ভার বাড়ল না অথচ ভেলাটা বেশ প্রশস্ত হয়ে গেল। তারপর বেশ কিছু ফল বোঝাই করে রওনা হলাম।

নদীর স্রোত আমার নৌকা বয়ে নিয়ে চল্ল। এবার বেশ আনন্দে চারদিক দেখতে দেখতে চল্লাম। কেন যেন মনে হতে থাকল বয়স বেড়েছে বলেই হয়ত আল্লা এবার আমাকে বিপর্যয়ে ফেলেও, সহনীয় কষ্টের মধ্যে রেখেছেন। মন ভরে আবার আল্লার গুণগান করলাম।

ছু' দিন ভালভাবে চলবার পর হঠাৎ নদীর স্রোত বেড়ে গেল। কি ছুর্বার গতি তার। আমার ভেলা ছুটল উল্কার মত। হা আল্লা! এ গতিতে যদি কোন কিছুর ওপর গিয়ে পড়ে তবে শেষ হয়ে যাবে যে সব! কিভাবে এ গতি রোধ করা যায়?

মনে হ'ল পাশে বাঁধা মোটা ডালগুলোর দিক ফিরিয়ে সামনে পিছনে করে দিতে পারলে এ গতি খানিকটা রোধ করা যেত। কিভাবে তা করা যায়! অনেক ভেবে একটা সরু ডাল ভেঙ্গে নিয়ে বৈঠার মত ব্যবহার করব বলে স্থির করলাম। ডালটা টানতেই বিপর্যয় ঘটে গেল। আমি ছিটকে পড়লাম পাটাতনের ওপর আর ফলের ঝুড়ি পড়ল আমার ঘাড়ে। আমি ফলের স্তূপে চাপা পড়লাম। যন্ত্রণায় আমার জ্ঞান লোপ পেল।

যখন জ্ঞান হ'ল, তখন পায়ে মাথায় অসহ্য যন্ত্রণা। পাটা ফুলে উঠেছে। নড়াচড়া করা কষ্টকর। সম্ভবত মাথাতেও আঘাত লেগেছে। আমি শুয়েই রইলাম।

দিন কয় সেভাবেই কেটে গেল। একদিন ছুপুরে হঠাৎ বহুজনের চিৎকারে তন্দ্রা ভাঙ্গল। অনুভব করলাম, ভেলার গতি থেমেছে। চোখ মেলতে দেখলাম আমি জালে বন্দী। জেলেরা চিৎকার করছে।

ওরা পরিত্রাহি গালাগাল করে আমাকে জাল মুক্ত করল। ওরা নদীর বুক জুড়ে জাল পেতে মাছ ধরে। স্রোতের টানে মাছ আপনা থেকেই তার ভেতর গিয়ে পড়ে। আজ পর্যন্ত এ নদীতে কেউ ভেলা নিয়ে আসে নি। তাই তারা আমাকে আপদই ভাবল। হয়ত' ছু-চার ঘা পড়তও আমার গায়ে, কিন্তু রক্ষা করল এক বৃদ্ধ। তাঁর দয়ায় আমি আশ্রয় পেলাম। তিনি আমাকে তাঁর বাড়িতে নিয়ে এলেন।

চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন। দিন কয়েকের মধ্যে আমি চলা ফেরার উপযুক্ত হয়ে গেলাম।

এই সময় সেই বৃদ্ধ এসে আমায় বল্লেন, বাবা! আমি তো তোমার বাঁচবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলাম। আল্লার দোয়াতেই তুমি বেঁচেছ। এবার তোমার পরিচয় বল।

আমি আমার পরিচয় দিলাম। আমার অভিযানগুলোর বর্ণনা শুনতে শুনতে চোখ বড় বড় হয়ে উঠল বৃদ্ধের। তিনি বললেন, আল্লাই তোমাকে বারবার রক্ষা করেছেন। তুমি তার দোয়া পেয়েছ। মহাভাগ্যবান তুমি। কটা দিন তোমাকে কাছে পেয়ে আমিও ধন্য হ'লাম। এবার তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে তুমি দেশে পাড়ি দাও।

আমি অবাক হ'লাম। কি ঐশ্বর্য আছে আমার কাছে! এসেছি এক বস্ত্রে। এখানে ওঁরা আমার পিছনে কত ব্যয় করেছেন। আমি বল্লাম, কোন ঐশ্বর্যের কথা বলছেন!

বৃদ্ধ বল্লেন, কেন! এ গাছগুলি!

আমি বল্লাম, ওগুলি ঐশ্বর্য কেন?

বৃদ্ধ বল্লেন, তাহলে বোঝা গেল ও গাছ না চিনেই তুমি সঙ্গে এনেছ। হয়ত' ওর সুবাস তেমোয় আকৃষ্ট করেছিল।

আমি বল্লাম, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ বল্লেন, ওগুলি মহামূল্যবান চন্দন গাছ। অনেক ওর দাম। আর তুমি যে ডালগুলি এনেছ, তা এত প্রাচীন যে ওর প্রতিটি কণার মূল্য সোনার চেয়ে বেশি। ওগুলি রক্ষা করা আমার পক্ষে দায় হয়ে পড়েছে। তুমি যদি চাও তো উচ্চমূল্যে ওগুলি এখানকার বাজারেই বিক্রি করে দিতে পার।

আমি বল্লাম, আপনি আমার জীবনদাতা। ওগুলির যা কিছু ব্যবস্থা আপনিই করুন। আপনি যা করবেন, তাতে আমার আপত্তি নেই।

বৃদ্ধ বল্লেন, তা হ'লে আমার সঙ্গে এখানকার বাজারে চল। বাজারটাও তোমার দেখা হবে।



বৃদ্ধ আমাকে বাজারে নিয়ে এলেন। তার লোকেরা আমার চন্দন কাঠের ডালগুলি নিয়ে এলো। একদল ব্যাপারী ঘিরে ধরল ডালগুলি। ডালগুলো কিনবার ইচ্ছা সকলেরই। বৃদ্ধ নিলামে তুললেন।

এক হাজার দীনার থেকে শুরু হ'ল। শেষে দাম উঠল দশ হাজার দীনার। বৃদ্ধ এবারের আমাকে বল্লেন, যথেষ্ট হয়েছে। এবার ছেড়ে দেয়েরাই ভাল।

আমি বল্লাম, আপনি যা ভাল বোঝেন।

বৃদ্ধ বললেন, না বাবা। তুমিও একটু বুঝে নাও। গত বছর থেকে এবার বাজার খুব মন্দা। সেই তুলনায় দশহাজার দীনার ভাল দামই উঠেছে। এ জন্যই ছেড়ে দিতে বলছি।

আমি বল্লাম, বেশ দিন।

বৃদ্ধ বল্লেন, বেশ। তবে আমি তোমাকে আরও একশ' দীনার বেশি দিচ্ছি। দশ হাজার একশ' দীনার। আমাকে ওগুলি দাও।

আমি বললাম, যে কি ! আপনি নিতে চান জানলে এ নিলামে তোলবার কি দরকার পড়ত।

বৃদ্ধ বললেন, না বাবা। তোমাকে আমি আশ্রয় দিয়েছি। এরপর যদি আমি বাজার যাচাই করে দাম না দিতাম তবে আজীবন আমার মনে হ'ত আমি তোমাকে আশ্রয় দেবার সুযোগে তোমাকে ঠকিয়েছি। এখন আমার আর গ্লানি থাকল না।

আমি অভিভূতের মত তাকে প্রণাম করলাম।

বাড়ি এসে বৃদ্ধ বলেন, এবার তোমার কাছে আমার একাট প্রস্তাব আছে।

আমি বলনাম, বলুন।

বৃদ্ধ বলেন, আমি বুড়ো হয়েছি। হয়ত' বছর দুই আরো বাঁচব। আমার কন্যার বিয়ে দিতে পারি নি। আমার ঐশ্বর্যের লোভে অনেকেই ওকে বিয়ে করতে চায়। কিন্তু তারা সকলেই বিলাসী।

অযোগ্য মানুষ। হয়ত' তাদের কারো সঙ্গেই শেষ পর্যন্ত কন্যার বিয়ে দিতে হ'ত। কিন্তু আল্লা তোমাকে কাছে এনে দিলেন। তোমাকে দেখে ওদের আরও ছোট মনে হচ্ছে। তুমি যদি অনুগ্রহ করে—কথা অসমাপ্ত রেখে বৃদ্ধ আমার হাত জড়িয়ে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে আমার সহমরণের দেশের কথা মনে পড়ে গেল।

আমি বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। হঠাৎ মনে পড়ল, বৃদ্ধের স্ত্রীও গত হয়েছেন' সহমরণের রীতি থাকল এ বৃদ্ধের পক্ষেও বেঁচে থাকা সম্ভব ছিল না। বুক থেকে পাষাণ-ভার নেমে গেল। আমি বল্লাম, আমার জীবনদান করেছেন আপনি। আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ করা আমার জীবনকে ধন্য করা।

বৃদ্ধ বলেন, তবে আমি সাদির আয়োজন করি।

আমি মাথা নত করলাম।

বৃদ্ধ কাজীকে ডেকে তক্ষুনি দিনক্ষণ ঠিক করে ফেল্লেন। মহা-ধুমধামে বৃদ্ধের কন্যার সঙ্গে আমার সাদি হয়ে গেল। আমার সেই সহধর্ম্মিণী আজও আমার গৃহ অলঙ্কৃত করে আছেন।

আমার বিয়ের বছর খানের পর বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি লোকজন ডেকে সকলের সামনে জানিয়ে দিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর সব সম্পত্তির অধিকারী হব আমি। আর তখন ইচ্ছে করলে সব বিক্রি করে দিয়ে আমার স্ত্রীকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে পারব।

আমি বল্লাম, আমি এ সব কিছুই চায় না। আপনি আরও দীর্ঘকাল বেঁচে থাকুন।

তিনি হাসলেন। বল্লেন, সবাইকেই যেতে হবে। তবে এমন আনন্দের মধ্যে যেতে পারাইতো সৌভাগ্য। বলতে বলতে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হ'ল। আধ ঘণ্টার মধ্যে তিনি চোখ বুঁজলেন।

তার সব পারলৌকিক কাজ মিটে গেল। আমি দিনকয়েক ধরে দীন-দুঃখীদের খাওয়ালাম। দেশে আমার জয় জয়কার পড়ে গেল। কিন্তু আমার স্ত্রী আমার দেশে আসবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

তাঁর তাড়াতেই সব সম্পত্তি বিক্রি করে বিপুল সম্পদ নিয়ে দেশে ফিরে এল।

বাদশা হারুণ আব রসিদ আমাদের জাহাজ ডুবির সংবাদ পেয়ে ছিলেন। তাই আমি যেদিন বাগদাদে ফিরে এলাম সেদিন তাঁরও আনন্দের সীমা রইল না। তিনি রাজদরবারে আমার সম্মানে এক ভোজসভা দিয়ে বসলেন। আমি প্রধান আমাত্যদের একজন তো ছিলামই এবার তাঁর সবচেয়ে প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলাম। এই হ'ল আমার শেষ সমুদ্র যাত্রার উপসংহার।

সিন্দ্‌বাদ বল্‌ল, আমার ভুল বুঝেছি জনাব। জীবন বাজি রেখেই ঐশ্বর্যকে অর্জন করতে হয়। শুধু শ্রম করলেও ঐশ্বর্য পাওয়া যায় না।

সিন্দবাদ বল্‌লেন, হিন্দবাদ। ঠিকই বলেছ তুমি। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রেখো—সুযোগের সদ্ব্যবহার না করলেও ঐশ্বর্য লাভ করা যায় না।

হিন্দবাদ বল্ল, জী জনাব!

হাসলেন সিন্দবাদ। তারপর আজও সিন্দবাদের হাতে তুলে দিলেন একশত দীনারের একটি থলি। সিন্দবাদ মাথা নত করে গ্রহণ করে। তখন সিন্দবাদ বল্লেন, এবার বলত, এই যে আমি প্রতিদিন তোমাকে একশত দীনার করে দিলাম, এগুলি তুমি কিভাবে খরচ করলে।

সিন্দবাদ বল্লল, জনাব। এ সব দীনার আমি খরচ করি নি। আমি মীনাবাজারে দোকানে নিয়েছি। ব্যবসা শুরুর আয়োজন চলছে। আমি প্রতিজ্ঞা করেছি জনাব, আপনি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছেন, আমি তার সদ্ব্যবহার করবই আর তা করলেই আপনার বদান্যতার মূল্য দেওয়া হবে।

সিন্দবাদ বল্লেন, আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকব হিন্দবাদ। আমি দেখতে চাই যে অপরের ঐশ্বর্য দেখে ঈর্ষা না করে তুমি নিজের শ্রমে ঐশ্বর্য গড়ে তুলেছ। প্রমাণ করেছ তোমার সামর্থ্যের, মনুষ্যত্বের, সাধনার।

হিন্দবাদ নত হয়ে কুর্ণিশ করল সিন্দ্‌বাদকে।